অলৌকিক কিতাব আল কুরআন

Al Quran

The Ultimate Miracle

মূল আহমেদ দিদাত অনুবাদ এ কে মোহাম্মদ আলী

অলৌকিক কিতাব

আল কোরআন

AL QURAN
THE ULTIMATE MIRACLE

অলৌকিক কিতাব
আল কোরআন

মূল : আহমেদ দিদাত

অনুবাদ : এ কে মোহাম্মদ আলী
প্রাক্তন পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

র‍্যাক্‌স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
RAQS Publications Series : 1

অলৌকিক কিতাব আল কোরআন
(Al Quran The Ultimate Miracle)
আহমেদ দিদাত

ISBN-984-32-1680-0

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশনায়
- আহসান পাবলিকেশন
  ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
  ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৯৩৭৪৮০
- খেয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ফোন : ০১৯১১০১২৯৭৬

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে, ২০০৫
তৃতীয় প্রকাশ : মার্চ, ২০০৮
রবিউল আউয়াল, ১৪২৯
চৈত্র, ১৪১৪

প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার

কম্পোজ : মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহমদ
আহসান কম্পিউটার, কাটাবন, ঢাকা।

মুদ্রণ : মীম প্রিন্টার্স, বাবুপুরা, ঢাকা-১০০০

বিনিময় ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Aloukik Kitab Al Quran (*Al Quran The Ultimate Miracle*) by AHMED DIDAT Translated by A K Mohammad Ali and Published by RAQS Publications, 230 New Elephant Road, Dhaka-1205 First Edition September, 1993 Third Edition March, 2008 Price : Tk. 50.00 ($ 1.00).

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে 'অলৌকিক কিতাব আল কোরআন' পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। মহাগ্রন্থ আল কোরআন মোজেযায় পরিপূর্ণ। এর শব্দাবলী, আয়াত এমনকি এক একটি অক্ষর ব্যাপক অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এর আসল অর্থ, তাৎপর্য আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

কোরআন বুঝার জন্য আমরা একে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। হতে পারে আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। আল্লাহ পাক হয়তো এর অন্যরকম অর্থ বুঝিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কেরাম প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং প্রখ্যাত তাফসীর গবেষকদের ব্যাখ্যা, আল কোরআনের অর্থ ও শিক্ষা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

বহু অমুসলিম পণ্ডিত, দার্শনিক বিশ্বাসই করেননি যে এটি আল্লাহর বাণী। তারা আল কোরআনকে মুহাম্মদ (সা)-এর রচনা বলে ধারণা করেন। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, বক্তা আহমেদ দিদাত এ বিষয়ে এই বইতে অনেকগুলো উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন যে কোন মানুষের রচনা নয় বরং এমন একটি কিতাব যে কোন মানুষ রচনা করতে পারে না– আল্লাহ পাক সূরা বনি ইসরাঈলের ৮৮নং আয়াতে একথা বলেছেন। আহমেদ দিদাত এ আয়াতের পক্ষেই কোরআন থেকে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে অকাট্য দলিল পেশ করেছেন।

প্রখ্যাত কম্পিউটার বিজ্ঞানী ড. রাশাদ খলিফার ২০০ পৃষ্ঠার The Perpetual Miracle of Muhammad গ্রন্থ থেকে তাঁর গবেষণার উদ্ধৃতি জনাব আহমেদ দিদাত-এ বইয়ে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশ বেতারের প্রাক্তন পরিচালক এ কে মোহাম্মদ আলী গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। এর একটি সংস্করণও ১৯৯৩ সালে তিনি প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন পর আবার গ্রন্থটি রিসার্চ একাডেমী ফর কুরআন এন্ড সাইন্স প্রকাশ করলো।

আশা করি পাঠকগণ এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন, আল কোরআনের অলৌকিক মোজেযা উপলব্ধি করবেন ও এই কিতাবের সঠিক হেদায়াত লাভে সক্ষম হবেন। আর তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের হেদায়াত নসীব করুন। আমিন ॥

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

আহমেদ দিদাত রচিত "আল-কোরআন দি আলটিমেট মিরাকল্ (AL QURAN THE ULTIMATE MIRACLE) পড়ার পর মনে হলো বইটি বাংলায় অনুবাদ করা হলে আমাদের দেশের মুসলমান ভাইয়েরা পবিত্র কোরআন যে অলৌকিক কিতাব, আল্লাহ্র মহিমা এবং আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা) যে খাতামুন্নাবিয়্যীন এবং রাহমাতাল্লিল আলামীন এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

বিদেশের বহু অমুসলিম চিন্তাবিদ, লেখক ও দার্শনিক এবং বহু দেশের শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত লোকদের ধারণা, কোরআন হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর রচনা। এই সম্পর্কে বইয়ে অনেক উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন মূল লেখক আহমেদ দিদাত। পবিত্র কোরআন যে মানুষের রচনা নয়, এমন কি হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর রচনাও নয়, এটা যে আল্লাহ্র কালাম অর্থাৎ আল্লাহ্ই এর রচনাকারী সে প্রমানটি তিনি অকাট্যভাবে প্রকাশ করেছেন তার লেখনীতে। আমি শুধু অনুবাদ করেছি। বইটিকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করেছি, এ জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে মর্মার্থ ঠিক রেখে বক্তব্য অনুবাদ করা হয়েছে। কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকলে আল্লাহ্র কাছে ও পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

অনুবাদে ভাষা সংশোধনের ব্যাপারে আমি আমার সহকর্মী, মুক্তিযুদ্ধের শব্দসৈনিক, কবি এবং চট্রগ্রামে প্রথম স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম বেলাল মোহাম্মদের কাছে ঋণী। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার পান্ডুলিপির ভাষা সংশোধন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বইটি ছাপানোর ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন রেডিও বাংলাদেশের প্রাক্তন পরিচালক ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সৈয়দ আশরাফ আলী।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের খেদমত করার জন্য দীর্ঘজীবন দান করুন।

এ কে মোহাম্মদ আলী

সূচীপত্র

◆ মূল পটভূমি ১৩

◆ আল কোরআনের অলৌকিকত্ব ১৩

◆ বৈজ্ঞানিক প্রমাণে কোরআনের বাণী ১৮

◆ পবিত্র কালামের বিশুদ্ধতা ২৪

◆ বিশ্বের খ্যাতনামা লেখকদের অভিমত ৩১

◆ ইহার উপর আছে উনিশ ৩৮

◆ গণনা ও শতাব্দীসমূহ ৪৪

◆ গ্রন্থকার কোন মানব নয় ৫০

◆ গাণিতিক অলৌকিকত্ব ৬০

◆ ভবিষ্যৎ বাণী এবং পূর্ণতা ৭১

◆ অতিরিক্ত সংযোজনী ৭৮

সাহায্যকারী পুস্তকের তালিকা

১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পবিত্র কোরআন এর অনুবাদ

২। What Bible Says about Mohammad (Sm) By Ahmed Deedat.

৩। "বিশ্ব ও সৌর জগৎ"- জনাব আবদুল জব্বার

৪। বাইবেলের নতুন নিয়ম- বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

৫। আল-কোরআন ও উনিশ- সৈয়দ আশরাফ আলী

প্রথম অধ্যায়

মূল পটভূমি

আল-কোরআনের অলৌকিকত্ব

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানব সমাজের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যখন কোন নবী বা রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষকে পরিচালিত হওয়ার নির্দেশ আসে, তখন মানুষ তা গ্রহণ না করে নবী ও রাসূলদের নিকট কোন 'যাদু' বা 'মোজেযা' অথবা কোন অলৌকিক ঘটনা দেখানোর দাবী করে থাকে।

হযরত ঈসা (আ) যখন তাঁর লোকদের মাঝে ধর্ম প্রচার শুরু করলেন, মানুষকে সৎপথে আসার আহ্‌বান জানালেন, নিষিদ্ধ কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী চলার উপদেশ দিলেন তখন তিনি (হযরত ঈসা আ) যে একজন নবী তা প্রমাণ করার জন্য লোকেরা তাঁকে 'মোজেযা' বা অলৌকিক ঘটনা দেখানোর দাবী জানাল। এই সম্পর্কে বাইবেলের মথি লিখিত ১২নং অধ্যায়ের ৩৮ ও ৩৯নং আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে :

> "৩৮ : এর পরে কয়েকজন ধর্ম শিক্ষক ও ফরিশী যীশুকে বললেন, গুরু, 'চিহ্ন' হিসাবে আমরা আপনার কাছ থেকে একটা আশ্চর্য কাজ দেখতে চাই।"
>
> "৩৯ : যীশু তাদের বললেন, এ কালের দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত লোকেরা 'চিহ্নের' খোঁজ করে; কিন্তু নবী যোনার[১] চিহ্ন ছাড়া আর কোন 'চিহ্নই' তাদের দেখানো হবে না।"

দেখা যাচ্ছে, হযরত ঈসা (আ) তাঁর লোকদের অনুরোধে কোন 'মোজেযা' বা অলৌকিক ঘটনা দেখানোর অস্বীকৃতি জানান। তবে পরবর্তীকালে অনেক

---

১. বাইবেলে বর্ণিত "যোনা" আমরা হযরত ইউনুস (আ)কে বুঝি। (অনুবাদক)

'অলৌকিক ঘটনা' বা 'মোজেযা' তিনি দেখিয়েছেন বলে আমরা বাইবেলের বর্ণনা থেকে জানতে পারি।

'মোজেযা' বা অলৌকিক ঘটনার বিবরণ বাইবেলে প্রচুর আছে। আসলে ঐ সব 'মোজেযা' বা 'নিদর্শন' অথবা অলৌকিক ঘটনাও মহান আল্লাহ্‌রই 'নিদর্শন।" ঐসব ঘটনা তিনিই তাঁর নবীদের মাধ্যমে করিয়েছিলেন। হযরত মূসার (আ) দ্বারা তিনিই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে ছিলেন।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের প্রায় ছয়শত বছর পর আরবের মক্কা নগরীতে হযরত মোহাম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি যখন আল্লাহর রাহে মানুষকে আসার জন্য এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন, তখন তাঁর দেশবাসী হযরত ঈসা (আ) বা পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের মতোই তাঁর কাছে 'যাদু' বা 'চিহ্ন' বা অলৌকিক ঘটনা দেখানোর দাবী জানাল, যা পবিত্র কালামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقَالُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط

তারা বলে কেন তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন প্রেরণ হয় না। (সূরা আনকাবূত : ৫০ আয়াত)

উপরোক্ত বক্তব্যই ছিল তাদের দাবী। সঠিকভাবে বলতে গেলে মক্কাবাসীরা হয়তঃ বলতে চেয়েছিল- "মোহাম্মদ, তুমি বেহেশতের দিকে একটি মই বা সিঁড়ি লাগিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে একটি কিতাব বা বই আমাদের সামনে নিয়ে আস, তাহলে আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করব।" অথবা "ঐ যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে এটাকে সোনার পাহাড় বানিয়ে দাও।" অথবা "মরুভূমির মাঝখানে একটি পানির নহর বইয়ে দাও. তা হলে তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করব।" অর্থাৎ তাদের কথায় কিছু 'যাদু' বা 'নিদর্শন' অথবা কোন 'অলৌকিক ঘটনা' দেখানো হলে তারা হযরত মোহাম্মদ (সা) কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। মোটকথা, এটাই ছিল মক্কাবাসীদের বক্তব্য।

তাদের এরূপ ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা) সুন্দর, নরম এবং মার্জিত ভাষায় মক্কার লোকদের ঐসব অযৌক্তিক কথার জবাব দিয়েছিলেন। "আমি কি তোমাদের বলেছি যে আমি একজন ফেরেশতা? আমি কি বলেছি যে, আল্লাহর সমস্ত ধন-সম্পদ আমার হাতে? শুধুমাত্র আমার নিকট যে সকল ওহী আসে আমি তাই অনুসরণ করি।"

দেখা যাক পবিত্র কোরআনে এই সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে সুগম্ভীর মর্যাদাসম্পন্ন কি উত্তর এসেছিল :

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

বল, নিদর্শন আল্লাহর এখতিয়ারে। আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। (সূরা আনকাবূত : ৫০নং আয়াত)

হযরত মোহাম্মদ (সা) পবিত্র কোরআনের আয়াত উল্লেখ করে তাঁর দেশবাসীর অযৌক্তিক দাবী-বিশেষ 'যাদু' বা 'নিদর্শন' দেখানোর অসারতা প্রমাণ করেন :

اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কোরআন অবতীর্ণ করেছি। যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়, অবশ্যই এতে অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে। (সূরা আনকাবূত : ৫১নং আয়াত)

পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহর রচনা এবং একটি অলৌকিক কিতাব-তা প্রমাণের জন্য উপরোক্ত আয়াতের আলোকে এখানে দুটি যুক্তি দেখানো যেতে পারে :

১. "আমি তোমার নিকট কোরআন অবতীর্ণ করেছি।" এখানে 'তুমি' শব্দটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই 'তুমি' শব্দটি শুধু মাত্র হযরত মোহাম্মদকে (সা) উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে- যিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষর অর্থাৎ লেখা-পড়া জানতেন না। আরবী ভাষায় 'উম্মী'। যিনি নিজের নামও লিখতে জানতেন না।

বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ও লেখক টমাস কার্লাইল[১] হযরত মোহাম্মদের (সা) লেখাপড়া ও শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন :

"One other circumstance we must not forget that he had no school learning, of the thing we call school learning not at all."

অর্থাৎ "অপরদিকে আমাদের ভুললে চলবে না যে বিদ্যালয়ের লেখা পড়া

---

১. টমাস কার্লাইল একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ছিলেন। ১৮৪০ সালে তিনি তাঁর 'ON HEROES AND HERO-WORSHIP' গ্রন্থের জন্য ওয়ার্ল্ড ক্লাসিকান-এ স্থান করে নেন।

বা শিক্ষা বলতে তাঁর (হযরত মোহাম্মদ (সা)) কিছুই ছিল না, স্কুল শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তাঁর কোনটাই ছিল না।"

আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা) যে নিরক্ষর এবং কোরআন রচনা করতে পারেন না মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এই সত্য প্রকাশ করলেন এবং জানালেন যে তিনি সত্যিই নিরক্ষর। কোরআন শরীফ কেন, তিনি কিছুই রচনা করতে পারেন না।

وَمَاكُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ.

তুমি তো কোন কিতাব পাঠ করনি, এর আগে নিজ হাতে কোন কিতাব রচনা করনি যে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।" (সূরা আনকাবূত : ৪৮নং আয়াত)

যদি হযরত মোহাম্মদ (সা) লিখতে ও পড়তে পারতেন, তাহলে রটনাকারী ও বাচালেরা বলে বেড়াতো যে কোরআন মোহাম্মদ (সা)-এর রচনা এবং কোরআন আল্লাহর কালাম, এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো। হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর লেখাপড়া জানা থাকলে শত্রুরা ঠাট্টা করে হলেও বলে বেড়াতো যে খুব সম্ভবতঃ ইহুদী এবং ঈসায়ীদের ধর্মগ্রন্থ নকল করে তিনি কোরআন রচনা করেছেন। তারা আরো বলতে পারতো যে বোধ হয় গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল এবং প্ল্যাটোর বই পড়ে 'তওরাত' এবং 'জবুরের' কথাগুলো গুছিয়ে সুন্দর ভাষায় হযরত মোহাম্মদ (সা) একটি কিতাব রচনা করেছেন। এই সব কথা বলার কারণ হয়তো অবিশ্বাসীদের থাকতো, যদি হযরত মোহাম্মদ (সা) লেখাপড়া জানতেন। কিন্তু অবিশ্বাসীদের এই 'হয়তো' যুক্তিটুকুও কোরআনে অস্বীকার করা হয়েছে উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে।

২. 'কোরআন' অর্থাৎ কিতাব? হাঁ এই 'কিতাব' শব্দটি নিজেই একটি গুরুত্ব বহন করে। প্রমাণ করে যে এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। এই 'কোরআন' বা কিতাবকে যে কোন দিক দিয়ে পাঠ করলে বা গবেষণা করলে এর সত্যতা বোঝা যাবে। পবিত্র কোরআনের রচনাকারী মহান আল্লাহ এই বিষয়ে অবিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জ করেছেন এই বলে :

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

তারা কি কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো হত, তবে তারা অবশ্যই ইহাতে অনেক অসংগতি দেখতে পেত (সূরা নিসা : ৮২নং আয়াত)

একমাত্র মহান আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিতাবের লেখক একাধারে ২৩ বছর যাবত কখনই তার উপদেশ বা শিক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে পারেন না। জীবনের বেশীরভাগ সময় বিরুদ্ধপূর্ণ উত্থান পতনে একজন মানুষ কোথাও না কোথাও এবং যে কোন সময়ে তার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হবেই। নিজেকে বিতর্কিত পথে নিয়ে যাবেই। কোন মানুষই তার শিক্ষা ও প্রচারকে একইভাবে ধরে রাখতে পারে না। পবিত্র কোরআন আজ পর্যন্ত যেভাবে ধরে রেখেছে।

আল্লাহর রাসূল হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর কাছে যখন বারবার 'মোজেযা' বা অলৌকিক ঘটনা দেখানোর দাবী করা হতো, তখন তিনি পবিত্র কোরআনের দিকে নির্দেশ করে বলতেন, "আল্লাহ্র কালামই হচ্ছে অলৌকিক।" অলৌকিকত্বের চরম উৎকর্ষ। জ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন সৎ ব্যক্তিরাই কোরআনের বাণীকে– পবিত্র কোরআনকে গ্রহণ করেছিলেন অলৌকিক বাণী হিসেবে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ তাই বলেছেন :

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ. وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ.

বস্তুতঃ এখানে এটা স্পষ্ট নিদর্শন যাদের অন্তরে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। একমাত্র জালিমেরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে। (সূরা আনকাবূত : আয়াত ৪৯)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক প্রমাণে কোরআনের বাণী

বর্তমান পৃথিবীতে ১২৫ কোটিরও বেশী মুসলমান দ্বিধাহীন চিত্তে পবিত্র কোরআনকে আল্লাহ্‌র বাণীরূপে গ্রহণ করেছে। এটা একটা অলৌকিক ঘটনা বলে মানতেই হবে। মহান আল্লাহ্‌র এই অলৌকিক কালাম সম্পর্কে মুসলমানদের শত্রুরা যখন একবাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তখন মুসলমানরা কেন তা গ্রহণ করবে না? রেভারেন্ড আর বসওয়ার্থ স্মিথ তার 'মোহাম্মদ ও মোহামেডানইজম' (Muhammad And Muhamadanism) "গ্রন্থে পবিত্র কোরআন প্রণয়ন সম্পর্কে বলেছেন : "A miracle of Purity of Style, of Wisdom And of Truth" অর্থাৎ "জ্ঞান ও সত্যের একটি অনুপম পবিত্র অলৌকিক লিখন।" অপর একজন ইংরেজ লেখক এ. জে আরবেরী পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে মুখবন্ধে লিখেছেন :

> Whenever I hear the Quran, chanted. It is as though, I am listening to music, underneath the flowing melody there is sounding all the time the instant beat of a drum. It is like the beating of my heart.
>
> অর্থাৎ "যখন আমি কোরআন শুনি বিমোহিত হই। মনে হয় যেন আমি সুমধুর সংগীত শ্রবণ করছি যা সর্বক্ষণ সুরের মুর্ছনায় আমার হৃদয়কে স্পন্দিত করে।"

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে মনে হবে তিনি একজন মুসলমান হিসেবে একথা বলেছেন কিন্তু আসলে তিনি তা নন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন একজন ঈসায়ী অর্থাৎ ক্রিশ্চিয়ান হিসেবে। তিনি ক্রিষ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন।

পরবর্তীকালে আরো একজন ইংরেজ– মারমা ডিউক পিক্‌থল পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন :

> "That inimitable symphony, the very sounds of which move men to tears and ecstasy"

অর্থ হলো– "এই এক অননুকরণীয় সুর মূর্ছনা–যার ধ্বনি মানুষকে চোখের অশ্রু এবং আনন্দ উল্লাসে অভিভূত করে।"

এই লেখক পবিত্র কোরআন অনুবাদ করার আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। কিন্তু আমরা জানি না ইসলাম গ্রহণের আগে না পরে তাঁর এই অনুভূতি এসেছিল। আল্লাহর সর্বশেষ কালাম পবিত্র কোরআনের প্রতি ইসলামের বন্ধু এবং শত্রুরাও নিঃশঙ্কচিত্তে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গেছেন।

হযরত মোহাম্মদের (সা) সমসাময়িক লোকেরা পবিত্র কোরআনের বাণীর সৌন্দর্যে, মহত্ত্বের উদারতায় এবং মর্যাদায় অভিভূত হয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন। অবিশ্বাসীরা এবং নাস্তিকেরা হয়তঃ বলতে পারে যে এইগুলো আত্মিক অনুভূতি। পরে অবশ্য আরবী জানে না বলে হয়ত নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইবে।

তারা হয়তঃ আরো বলতে পারে "আমি যা দেখি না, তুমি তা দেখ। আমি যা অনুভব করি না, তুমি তা অনুভব কর। কি ভাবে আমি জানবো যে আল্লাহ আছেন এবং তিনিই মোহাম্মদ (সা)-কে কোরআনের এই সুমধুর বাণী দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছেন?" তারা হয়ত আরো বলতে পারে, "কোরআনের মধ্যে দর্শনের যে সৌন্দর্য আছে, যে বাস্তব নীতিকথা আছে এবং আদর্শ আছে তার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি মোহাম্মদ (সা)-কে সহজ সরল মানুষ হিসেবে মেনে নিতে রাজী আছি। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য অনেক নীতি কথা দিয়ে গেছেন, যা সৌন্দর্যে ভরপুর। আমি যা মানতে পারি না তা হলো তোমরা মুসলমানরা তাঁকে 'নীতি শাস্ত্রের একজন অতি অসাধারণ ব্যক্তি' বলে মনে কর।"

এই সব নাস্তিকদের সন্দেহ দূর করার জন্য পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরে নিদর্শন দেখিয়েছেন। বিজ্ঞানের অভিজ্ঞান নিয়ে নাস্তিক ও অবিশ্বাসীরা নিজেদেরকে একবিরাট পুরুষ বলে জাহির করে থাকেন। আসলে তারা হচ্ছে 'বামন' বা ক্ষুদ্রাকৃতির। বামনদের শরীর সাধারণ মানুষের মতো সমপরিমানে বাড়ে না। কারো মাথা বড়, কারো হাত পা ছোট আবার কারো বা শরীর ছোট। মেধা ও বুদ্ধিসম্পন্ন এই সব বিজ্ঞানী বামনরা জ্ঞানের উচ্চশিখরে পৌছেও আত্মিকভাবে ছোট থেকে গেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের পরিতৃপ্তির জন্য এই সব নাস্তিক ও অবিশ্বাসী বিজ্ঞানী 'বামন'-দের সাথে কিছু কাল্পনিক কথপোকথনের অবতারণা এখানে করা যাক। ধরে নেয়া যাক, আল্লাহ বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলেন : "হে বিজ্ঞানীরা, তোমরা

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তোমরা বড় বড় টেলিস্‌কোপ দিয়ে গ্রহ, নক্ষত্র ও ছায়াপথসমূহ পর্যবেক্ষণ করছ, নতুন নতুন গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান পাচ্ছ। বলতো, এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি বা সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল? অন্তর্দৃষ্টিহীন নাস্তিক মহাবিজ্ঞানীরা সাথে সাথে উত্তর দেবে, কেন! কোটি কোটি বছর আগে এই মহাবিশ্ব একটি ছোট ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড ছিল। হঠাৎ করে এই ছোট জড় পিণ্ডের মাঝখানে ঘটে গেল এক বিরাট বিস্ফোরণ"[২] (Big Bang)। ফলে বিভিন্ন বস্তু প্রচণ্ড গতিতে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এই বিরাট বিস্ফোরণের কারণে (Big Bang) মহাবিশ্বের সৌরজগৎসমূহ, ছায়াপথ এবং অন্যান্য সব কিছুর সৃষ্টি হলো। মহাশূন্যে তখন যেহেতু কোন প্রতিবন্ধক বা বাধা বিঘ্ন ছিল না, সেই হেতু তারা গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াতে লাগলো। এই বিস্ফোরণের কারণে আমাদের সৌরজগতের সৃষ্টি হলো। আমাদের এই মহাবিশ্ব অনবরত সম্প্রসারিত হচ্ছে বলে প্রত্যেকে একে অপরের কাছ থেকে প্রচণ্ড গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে এবং একসময় তারা আলোর গতি লাভ করবে। পরে আমরা আর তাদেরকে দেখতে পাবো না। এদেরকে দেখার জন্য আমাদের খুব তাড়াতাড়ি আরো বড়, আরো উন্নত ধরনের টেলিস্কোপ তৈরী করতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে আমরা তাদেরকে মোটেই দেখতে পাবো না।

এইবার আমরা এই নাস্তিক মহাবিজ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করতে পারি, "এই অলীক কাহিনী তোমরা কবে আবিষ্কার করলে?" তাদের কাছে থেকে আমরা উত্তর পাব, "এটা কোন অলীক কাহিনী নয়, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য।" আমাদের উত্তর হতে

---

২ Big Bang থিওরী বা "বিরাট বিস্ফোরণ" থিওরী বর্তমান শতাব্দীর আবিষ্কার। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আবদুল জব্বার তাঁর "বিশ্ব ও সৌরজগৎ" বই এর ৫ম পৃষ্ঠায় এই Big Bang থিওরী সম্পর্কে বলেছেন : "এমন এক সময় ছিল, যখন বিশ্বের সমস্ত কিছু একটি অতিক্ষুদ্র, অতিঘন, অতি উত্তপ্ত অগ্নিপিণ্ডে একীভূত ছিল। বিকীর্ণ রেডিও তরঙ্গ হচ্ছে ঐ অতিক্ষুদ্র, অতিঘন অগ্নিপিণ্ডের বিস্ফোরণের শেষ নিদর্শন। সেই পিণ্ডের ভিতরে এক সময়ে স্থান, পদার্থ, তেজ সমস্তই নিহিত ছিল। উল্লেখিত দুটি বিষয় একত্রে বিবেচনা করে বলা যায় যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি অতিক্ষুদ্র, অতিঘন, অতি উত্তপ্ত অগ্নিপিণ্ডের বিরাট বিস্ফোরণে মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর সৃষ্টির সূচনা হয়। একেই বলা হয় সৃষ্টির বিরাট বিস্ফোরণ (Big Bang) তত্ত্ব।" এই সম্পর্কে তিনি আরো লিখেছেন, "এখন মনে করা হয় যে এক হাজার বা দুই হাজার কোটি বৎসর পূর্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি মাত্র অতিক্ষুদ্র, অতিঘন, অতি উত্তপ্ত অগ্নি গোলকের মধ্যে নিহিত ছিল। চাঁদ, সূর্য, তারা, ছায়াপথ ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব ছিল না। সেই অগ্নি গোলক কোথা থেকে এলো, কিভাবে তার সৃষ্টি হলো সে কথা কেউ জানে না বা সে সম্বন্ধে কোন স্বীকৃত তথ্যও নেই। (অনুবাদক)

পারে, ঠিক আছে। তোমরা কখন এই বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করলে? "তারা হয়ত বলবে, কেন এই কিছুদিন আগে অর্থাৎ এই বছর পঞ্চাশ আগে!" মানুষের ইতিহাসে এই পঞ্চাশ বছর হয়ত কিছু দিন হতে পারে। অথচ চৌদ্দশত বছর আগে আরবের মরুভূমিতে জন্মগ্রহণকারী কোন নিরক্ষর মানুষের এই 'বিরাট বিস্ফোরণ' (Bing Bang) তত্ত্ব এবং সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব (Expanding universe) তত্ত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকার কথা ছিল কি? নাস্তিক মহাবিজ্ঞানী হয়ত উত্তর দেবে, মোটেই নয়। তা হলে দেখা যাক আল্লাহর কাছে থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে মরুভূমির সেই নিরক্ষর মানুষটি চৌদ্দশত বছর আগে কি বলেছিলেন-

اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ. كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا.

অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রিত ছিল ওতপ্রোতভাবে তাদেরকে পৃথক করার পূর্বে। (সূরা আম্বিয়া : ৩০ আয়াত)

এবং

وَهُوَالَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ.

এবং আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন, রাত্রি ও দিবসকে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে, তারা সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। (সূরা আম্বিয়া : ৩৩ আয়াত)

যে বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এইসব অপরূপ সত্য আবিষ্কার করে চলেছে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই এইসব কথা বলা হয়েছে। তারা তা জানে না, কারণ তারা অন্ধ। তারা এই অপরূপ ঐশীবাণীর রচনাকারীকে দেখতে পায় না।

টমাস কার্লাইল বলেছেন–

"With our sciences and cylopaedias, we are apt to forget the divineness, in those laboratories of ours. Where on earth could a camel driver in the desert have gleaned your facts fourteen hundred years ago except from the makers of Big Bang himself ?"

"আমাদের গবেষণাগারে বিজ্ঞান এবং বিশ্বকোষে মগ্ন থেকে আমরা ঐশী শক্তিকে ভুলে থাকায় তৎপর। যেখানে পৃথিবীতে মরুভূমির একজন

উটচালক তোমাদের এই বিরাট বিস্ফোরণ" (Big Bang) তত্ত্বের সত্যতা সৃষ্টিকর্তার সাহায্য ছাড়া চৌদ্দশত বছর আগে উদঘাটন করতে পারতেন কি?"

সমস্ত প্রাণের অথবা জীবনের উৎপত্তি বা সৃষ্টি বিষয়টি প্রাণীবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানীদের নখদর্পণে। যিনি প্রাণের সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা এখনো দুঃসাহস দেখাচ্ছে। প্রাণী-বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করা যাক তাদের গর্বিত গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে। তারা কি বলতে পারে, প্রাণের উৎপত্তি কোথায়? অবিশ্বাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী সহকর্মীদের মতোই প্রাণী বিজ্ঞানীরা বলতে পারে, কোটি কোটি বছর আগে সমুদ্রেই প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ কোটি কোটি বছর আগে সমুদ্রের মধ্যে এক আদিম বস্তু থেকে জীবনের মূলীভূত উপাদানের প্রজনন শুরু। যার থেকে বেরিয়ে আসে এ্যামিবা (Amoeba) এবং সমুদ্রের পঙ্কে প্রোথিত বস্তু থেকে তার জীবনের বিকাশ লাভ করেছে। এক কথায় জীবনের বা প্রাণের উৎপত্তি সমুদ্রে অর্থাৎ পানি থেকে

প্রাণীবিজ্ঞানীরা কখন এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে যে জীবনের উৎপত্তি পানি থেকে? উত্তরটা ঠিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতো হয়ত হবে; এই কিছুদিন আগে। চৌদ্দশত বছর আগে কোন নিরক্ষর দার্শনিক, কবি অথবা নীতিশাস্ত্রবিদ তোমাদের এই আবিষ্কার সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারতো? জীব বিজ্ঞানী হয়ত জোরগলায় উত্তর দেবে, 'না কোন ক্রমেই নয়।' শোনা যাক, চৌদ্দশত বছর আগে মরুভূমির নিরক্ষর সন্তান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে কি বলেছিলেন :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ. كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

[৩]এবং আমি সৃষ্টি করলাম পানি হতে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তু তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (সূরা আম্বিয়া : ৩০ আয়াত)

---

৩ জনাব আবদুল জব্বার তাঁর 'বিশ্ব ও সৌরজগৎ' বই-এর 'জীবনের উপাদান' অধ্যায়ে পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি সম্পর্কে লিখেছেন... "এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় পৃথিবীর আদি পানিতে, হয়তো বা সমুদ্রে অথবা নদীতে অথবা স্থলভাগের উষ্ণ প্রস্রবনে। পানির মধ্যে এমিনো এসিডের অণুসমূহ ঘটনাক্রমে বিভিন্নভাবে সংযোজিত হতে থাকে। ...জীবন সৃষ্টির প্রারম্ভে লক্ষ লক্ষ বৎসর এই প্রকার সংযোজনের মাধ্যমে প্রোটিন সৃষ্টির উপযুক্ত সংযোজন ঘটে এবং প্রোটিন বৃহদানুর সৃষ্টি হয়। ঠিক একইভাবে নিউক্লিক এসিডেরও সৃষ্টি হয়। অবশেষে আরো লক্ষ লক্ষ বৎসর প্রণয় নিবেদনের পরে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলেই জীবনের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই মহামিলনের পূর্বে আরো অনেক ঘটনা, দুর্ঘটনা, আবেদন, নিবেদন, সমর্পণ, প্রত্যাখ্যান অনেক কিছু ঘটে। জীবন সৃষ্টির আদি কাঠামো হয়ত অনেকটা এইরূপ ছিল।" (অনুবাদক)

উপরোক্ত আয়াত থেকে এটা কারো পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই আয়াতগুলো সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে সন্দেহবাদী বৈজ্ঞানিকদের জন্য পাঠান হয়েছে। যা চৌদ্দশত বছর আগে মরুভূমির একজন নিরক্ষর বাসিন্দার নিকট সঠিকভাবে পৌঁছেছিল। এই সকল আয়াতের নাযিলকারী তাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন। তোমরা কেন আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস আনবে না? বিজ্ঞানী হিসেবে সব কিছু জানার পরও তাদের শেষ অবিশ্বাসী ব্যক্তি হওয়ার কথা। অথচ তারাই আজ অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত। কি দুর্বলতা তাদেরকে পেয়ে বসেছে?

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ, প্রাণীতত্ত্ববিদ এবং পদার্থবিদগণ প্রকৃতির বিস্ময়কর বস্তুর অন্তর্নিহিত দৃশ্য দেখেও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে অস্বীকার করে। তাদের জানা দরকার, আল্লাহ্র নবী হিসেবে হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর নিকট চৌদ্দশত বছর আগে কি আয়াত নাযিল হয়েছিল।

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ.

পবিত্র ও মহান তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন সকল বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় তার মধ্যে যা পৃথিবী উৎপন্ন করে এবং তাদের নিজেদের জন্য এবং ঐসব বস্তু যাদের সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। (সূরা ইয়াসীন : ৩৬ আয়াত)

আল্লাহ্র কালামের এই আয়াতগুলো খুবই পরিষ্কার। মানুষ কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রত্যেকটি বিষয়েই কোরআনের ছাত্ররা আল্লাহ্র সঠিক নির্দেশ দেখতে পায়। এইগুলো হচ্ছে সন্দেহাতীতভাবে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত 'নিদর্শন' ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ.

এতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন। (সূরা রূম : ২২ আয়াত)

অদৃষ্টের কি পরিহাস। আজকের জ্ঞানী ব্যক্তিরাই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণাকারী এবং অবিশ্বাসী। তাদের বস্তুগত জ্ঞান বা পার্থিব জ্ঞানই হচ্ছে তাদের কাল। প্রকৃত জ্ঞানের সাথে উপযুক্ত বিনয়ের অভাব নিয়েই তারা পৃথিবীতে বিরাজ করছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্র কালামের বিশুদ্ধতা

অতীতের মানুষের জন্যে আল্লাহর কালামে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলো চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু বর্তমান কালের অবস্থা কি? আজকের দুনিয়ার "অসার অলৌকিক বস্তু ইলেকট্রনিক যাদু" –কম্পিউটার! যাকে 'মানব মেধার শিশু' বলে পরিহাস করা হয়! (সূত্র : টাইম ম্যাগাজিন ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৭৮)

পবিত্র কোরআন যে আল্লাহর বাণী এবং একটি অলৌকিক কিতাব সে সম্পর্কে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে নতুন বিষ্ময়কর তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। এখানে 'অলৌকিক' শব্দের একটি সহজ সরল অর্থ খুঁজে পাওয়া গেছে। আর তা হলো 'মনুষ্য শক্তির বহির্ভূত একটি কর্ম'। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন কোন মানুষ দ্বারা রচিত গ্রন্থ বা কিতাব নয়, হতে পারে না এবং তা কোন মানুষের রচনার সাধ্যের বাইরে। আর এই পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহর কালাম এবং একটি অলৌকিক গ্রন্থ, তা অবিশ্বাসী এবং নাস্তিকদের কাছে কিভাবে প্রমাণ করব? প্রকৃত বিজ্ঞান এবং গনিতশাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করে আমরা তাদের মনে বিশ্বাস স্থাপনে সক্ষম হবো। কারণ গণিতশাস্ত্র সব সময়ই নিরপেক্ষ এবং এর আবেদন বিশ্বব্যাপী।

পবিত্র কোরআন যে অলৌকিক গ্রন্থ বা কিতাব -তা দেখতে, অনুভব করতে, স্পর্শ করতে এবং এর ভাষা বুঝতে হলে কোন আমেরিকান, কোন ইউরোপিয়ান, কোন রাশিয়ান বা কোন এশিয়াবাসীর কোরআন সম্পর্কে প্রচুর লেখাপড়ার প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজন, দেখার জন্য শুধু দু'টি চোখ এবং ১৯ পর্যন্ত গণনা করার সামর্থ।

পবিত্র কোরআনের এই সর্বশেষ প্রাপ্ত অলৌকিকত্বকে সমর্থন করতে গিয়ে শুরুতে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা জানা থাকা দরকার। হযরত মোহাম্মদ (সা) তাঁর ওফাতের পূর্বে সূরাগুলো যেভাবে স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেভাবেই বর্তমান কোরআন গ্রন্থিত করা আছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনের বাণী বা আয়াত সেভাবে নাযিল হয়নি। এর নাযিল হওয়ার সময়ানুক্রম কিন্তু

অন্যরকম। সম্পূর্ণ কোরআন হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর নিকট ২৩ বছর ধরে অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুযায়ী নাযিল করা হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থিত কোরআনের ধারাবাহিকতার সাথে যার মিল নেই।

পবিত্র কোরআন যখন সর্ব প্রথম নাযিল হয়, তখন হযরত মোহাম্মদ (সা) মক্কা নগরীর তিন মাইল উত্তরে এক পাহাড়ের গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তারিখটা ছিল রমযান মাসের ২৭। তাঁর বয়স ছিল ৪০। অভ্যাস বশতঃ তিনি সেখানে যেতেন কখনও একা, কখনও তাঁর প্রিয় পত্নী উম্মুল মোমেনিন খাদিজাতুল কোবরা (রা) সহ। যখন কোরআন প্রথম নাযিল হয়, তখন তিনি ছিলেন গুহার মধ্যে একা। হযরত মোহাম্মদ (সা) দেখতে পেলেন ফেরেশতা জিব্রাইল (আ) হযরত মোহাম্মদ (সা)-কে তাঁর মাতৃভাষায় আরবীতে নির্দেশ দিলেন, 'ইক্‌রা' অর্থাৎ 'পড়'।[৪] প্রথমবার জিব্রাইল (আ) সূরা আল-আলাক এর প্রথম ৫টি আয়াত হযরতকে শিক্ষা দিলেন, যা বর্তমান কোরআন শরীফের ৯৬তম সূরার অংশ হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। মহান আল্লাহ্ হযরত মোহাম্মদকে (সা) তাঁর মুখপাত্র হিসেবে নির্বাচন করলেন। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সা) এই অবস্থার জন্য মোটেই তৈরী ছিলেন না। বিষয়টির নিশ্চয়তা এবং সমর্থনের জন্য তিনি দ্রুত তাঁর সহধর্মীনির কাছে ঘরে ফিরে গেলেন। তিনি ভয়ে বিমূঢ় এবং বিস্ময়াভীভূত হয়েছিলেন।

প্রাথমিক অবস্থা কেটে যাওয়ার পর তিনি আয়াতগুলিকে মনে গেঁথে নিলেন। এই বিষয়ে নতুন স্বাদ পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন।

হযরত মোহাম্মদের (সা) নিকট সর্ব প্রথম নাযিলকৃত সূরা।

সূরা : আল-আলাক, সূরা নং-৯৬

بسم الله الرحمن الرحيم

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ.

১। পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন।

---

৪. হযরত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উত্তর দিয়ে ছিলেন ما انا بقارء যার অর্থ "আমি লেখাপড়া জানি না।" হযরত দুইবার এইরূপ বলার পর তৃতীয়বার জিব্রাইল (আ) তাঁকে পুরো আয়াতটি বললেন। (অনুবাদক)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

২। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ.

৩। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত।

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.

৪। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন-

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

৫। শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যা সে জানত না।

উপরোক্ত ৫টি আয়াত সূরা আল-আলাকের। বর্তমানে পবিত্র কোরআনের ৯৬তম সূরার অংশ এবং যা হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর নিকট জিব্রাইল (আ) কর্তৃক মহান আল্লাহর নির্দেশে নাযিল করা হয়।

আল্লাহ্ এবং মহৎ জীবন সম্পর্কে প্রচার শুরু করতে তাঁকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হলো। অবিশ্বাসীরা তাকে 'পাগল' অথবা 'ভূতে পাওয়া' [৫]লোক বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করল। যা হোক, 'পাগল' অথবা 'ভূতে পাওয়ার' জবাবে দ্বিতীয় বার আরো কিছু আয়াত নিয়ে হাজির হলেন জিব্রাইল (আ), যা বর্তমানে কোরআনের ৬৮নং সূরা আল-কালামে লিপিবদ্ধ আছে। 'পাগল' অথবা 'ভূতে পাওয়ার' জবাবে সূরা আল কালামের ২নং আয়াতটি দেখা যেতে পারে :

مَااَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ.

তুমি নও তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল অথবা ভূতে পাওয়া। (সূরা আল কালাম : ২ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ অবিশ্বাসী কর্তৃক হযরত মোহাম্মদ (সা)-কে দেয়া 'ভূতে পাওয়া, ও 'পাগল' অভিযোগ নাকচ করে দিলেন। এবং জানিয়ে দিলেন হযরত মোহাম্মদ (সা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুস্থ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি।

---

৫ হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন "আস সাদিক আল ওয়াদাল আমিন"। তাই তাঁকে কেউ মিথ্যাবাদী বলতে সাহস পেতো না। যার জন্যে আরবের লোকেরা তাঁকে "ভূতে পাওয়া" অথবা "পাগল" বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছিল। (অনুবাদক)

দ্বিতীয় বার নাযিলকৃত সূরার অংশ বিশেষ

সূরা ঃ আল-কালাম, সূরা নং ৬৮

بسم الله الرحمن الرحيم

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ.

১। নূন-শপথ কলমের এবং ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার।

مَآاَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ.

২। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল 'অথবা' ভূতে পাওয়া নও।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ.

৩। তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

৪। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

কিন্তু মানুষের অভ্যাস হলো সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং জ্ঞানীকে পাগল বলে সাব্যস্ত করা। হযরত ঈসা (আ)-এর শত্রুরাও তাকে এইরূপ ব্যবহার থেকে অব্যাহতি দেয়নি। বাইবেলেও হযরত ঈসার (আ) ধর্ম প্রচার সম্পর্কে বলা হয়েছে। "তাদের মধ্যে অনেকে বলল তাকে ভূতে পেয়েছে, সে পাগল, তোমরা তার কথা কেন শুনছ?" (যোহন লিখিত ১০নং অধ্যায়ের ২০নং আয়াত)

এমনকি হযরত ঈসা (আ)-এর প্রিয় সহযোগীরাও তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। মার্ক লিখিত ৩নং অধ্যায়ের ২১-২২ আয়াতে বলা হয়েছে :

"যীশুর আত্মীয়রা এই খবর শুনে তাঁকে 'বের করে নিতে আসলেন। তারা বললেন ও পাগল হয়ে গেছে। জেরুজালেম থেকে যে ধর্ম শিক্ষকরা এসেছিলেন তারা বললেন ওকে বেলেসবুলে (শয়তান) পেয়েছে। মন্দ আত্মাদের রাজার সাহায্যেই ও মন্দ আত্মা ছড়ায়।"

হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক অনেক 'মোজেযা' বা অলৌকিক ঘটনা দেখানোর পরও বাইবেলে বলা হয়েছে- যীশুর ভাইয়েরাও যীশুকে বিশ্বাস করতেন না। ভাগ্যক্রমে

আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে এরূপ ঘটেনি। প্রথম দিকের বিশ্বাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিলেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং নিকটজন, যারা তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভাল জানতেন।

*দ্বিতীয়বার নাযিল হওয়া আয়াতসমূহে আমরা দেখতে পাই হযরত মোহাম্মদের (সা) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ 'পাগল' ও 'ভুতে পাওয়া' খণ্ডন করা হয়েছে। তারপর হযরত জিব্রাইল (আ) নিয়ে এলেন সূরা মুযযাম্মিল, যা কোরআন শরীফের ৭৩নং সূরা হিসাবে লিপিবদ্ধ। এখানে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৫নং আয়াতটির উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا.

"আমি শীঘ্রই তোমার কাছে নাযিল করব গুরু গম্ভীর বাণী"।

আল্লাহর প্রিয় নবীর কাছে এতদিন পর্যন্ত যে সকল আয়াত এসে পৌঁছেছিল, তা ছিল সুন্দর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আয়াতের রচনাকারী আরো অসাধারণ কিছু তাঁর নবীর জন্য রেখেছিলেন।

চতুর্থ বার হযরত জিব্রাইল (আ) আমাদের নবীকে সূরা মুদদাসসির-এর অর্ধেকেরও বেশী আয়াত শিক্ষা দিলেন, যা কোরআন শরীফের সূরা নং ৭৪ হিসেবে চিহ্নিত। ৩০নং আয়াতটি ছিল "আলাইহা তিস্‌আতা আশারা।"

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

এর উপরে আছে ১৯ (উনিশ)

---

* দ্বিতীয়বার ৬৮নং সূরার ৯টি আয়াত নাযিল হয়। অবশ্য এখানে শুধুমাত্র ৪টি আয়াত উল্লেখ করা হলো। কারণ "পাগল" "অথবা ভূতে পাওয়ার" জবাবে ২নং আয়াত এবং রাসূল (সা) যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুস্থ এবং জ্ঞানী ও মহান তার জন্য ৪নং আয়াত পর্যন্ত দেখানো হলো। (অনুবাদক)

তৃতীয় বার নাযিলকৃত সূরার অংশ

সূরা-মুয্যাম্মিল, সূরা নং-৭৩

بسم الله الرحمن الرحيم.

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ.

১। হে বস্ত্রাবৃত।

قُمِ الَّيْلَ اِلَّاقَلِيْلاً

২। রাতে জেগে থাক (ইবাদতের জন্য) কিছু অংশ ছাড়া

نِّصْفَهُ اَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً.

৩। আধারাত অথবা তার চেয়ে কম

اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً.

৪। অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী। আর কোরআন পড় ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।

اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً.

৫। আমি শীঘ্রই তোমার কাছে নাযিল করব গুরুগম্ভীর বাণী।

তৃতীয় বার সূরা মুয্যাম্মিলের ১০টি আয়াত নাযিল করা হয়। ৫ম আয়াতটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এখানে ৫ম আয়াত পর্যন্ত উল্লেখ করা হলো।

হযরত মোহাম্মদকে (সা) একই সময়ে অনেক বেশী আয়াত অর্থাৎ সূরা মুদদাসসির-এর ৩০টি আয়াত জিব্রাইল (আ) শিক্ষা দিলেন। এটাই ছিল আয়াত নাযিল হওয়ার এই পর্যন্ত দীর্ঘ সময়। এর আগে কখনও ৫টি আয়াত, কখনও ৯টি আয়াত আবার কখনও ১০টি আয়াত নাযিল করা হয়। এই একই সময়ে হযরত জিব্রাইল (আ) সূরা মুদদাসসির-এর বাকী ২৬টি আয়াত নাযিল করলে মুদদাসসির সম্পূর্ণ হতো। কিন্তু মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনকে এক অলৌকিক কিতাব হিসেবে স্থাপন করবেন বলে ঐ একই সময়ে সূরা মুদদাসসির সম্পূর্ণ করালেন না। তাই সূরা মুদদাসসির এর ৩০নং আয়াত "আলাইহা তিসআতা আশারা" বলার পর হযরত জিব্রাইল (আ) থেমে গেলেন। আর এটাই হচ্ছে সূরা মুয্যাম্মিল এর ৫নং আয়াতে বর্ণিত সুন্দর, প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আয়াত।

চতুর্থ বার নাযিলকৃত সূরার অংশ

সূরা মুদদাসসির, সূরা নং–৭৪

بسم الله الرحمن الرحيم.

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.

১। হে বস্ত্রাচ্ছাদিত।

قُمْ فَاَنْذِرْ.

২। উঠ সতর্কবাণী প্রচার কর।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

৩। এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

৪। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.

৫। এবং সমস্ত অপবিত্রতা হতে দূরে থাক

وَلَاتَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

৬। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

৭। এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য্য ধারণ কর।

এভাবে ৩০নং আয়াতে

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

ইহার উপরে আছে উনিশ

এখানে এসে জিব্রাইল (আ) থেমে গেলেন।

চতুর্থ বারে এই সূরার ৩০টি আয়াত নাযিল হয়। এই উপরোক্ত ৩০নং আয়াতটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্বের খ্যাতনামা লেখকদের অভিমত

('আলকোরআন মহাসত্য')

সূরা মুদদাসসির এর ৩০নং আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এটাকে অন্যান্য অভিযোগের জবাব হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ অবিশ্বাসীরা হযরত মোহাম্মদকে (সা) 'পাগল' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল। তারা যখন দেখল যে আরবের লোকেরা এবং হযরতের আত্মীয়-স্বজন, নিকটজন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে লাগলো এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও ধীরে ধীরে ইসলাম কবুল করতে শুরু করল, তখন অবিশ্বাসীরা তাদের অভিযোগের ধারা বদলিয়ে ফেললো। তারা মোহাম্মদকে (সা) তখন 'পাগলের' পরিবর্তে 'যাদুকর' হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালালো। তারা এই বলে অভিযোগ আনতে শুরু করলো যে হযরত মোহাম্মদ (সা) কোরআনের সুন্দর সুন্দর আয়াতগুলোর দ্বারা লোকজনকে সম্মোহিত করছেন, যাদু করছেন।

হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে আনীত এই নতুন অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশ্ব বিখ্যাত লেখক টমাস কার্ললাইল পরবর্তীকালে অবিশ্বাসীদের এই অভিযোগের জবাব সুন্দর করে লেখনীতে প্রকাশ করেছিলেন।

"Forger and Juggler? No, no! This great fiery heart, seething, simmering like a great furnace of thoughts, was not a juggler."

"অর্থাৎ প্রতারণা এবং ভেল্‌কি? না, কখনই নয়! এই মহৎ তেজোদীপ্ত হৃদয় যিনি চিন্তার জগতে এক বিরাট আলো নিয়ে সুন্দর ও ধীর গতিতে প্রভাব বিস্তার করছিলেন, তিনি কখনই বাজীকর ছিলেন না?"

সেই সময় মক্কার কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকগণ মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ বুঝতে অক্ষম ছিল। পুরুষ ও মহিলারা পশুর মতো জীবন ধারণ করতো। এরাই যখন মোহাম্মদ (সা)-এর সুন্দর আহ্বানে সাড়া দিলো, তখন অবিশ্বাসীরা এটাকে যাদু

বা ভেল্‌কিবাজী বলে আখ্যায়িত করতে লাগলো। আসলে তারা ছিলো তাদের যুগের এবং পরিবেশের শিকার। এর প্রেক্ষিতে সূরা মুদদাসসির-এর ২৪নং আয়াতে অবিশ্বাসীদের অভিযোগের বর্ণনা দেয়া আছে, "এটা যাদু ছাড়া কিছুই নয়।" কিন্তু এই সূরার ২৫নং আয়াতে বর্ণিত অবিশ্বাসীদের অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর।

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ.

(এটাতো মানুষেরই কথা।)

সেই যুগের অবিশ্বাসীদের মতো বর্তমান যুগেও অমুসলিম বন্ধু ও সমালোচকরা এই একই ধারণা পোষণ করে থাকেন। এমনকি ইসলামের সুহৃদ সমালোচক বন্ধু টমাস কার্লালাইলও এ দোষ থেকে মুক্ত নন। এই দুর্বলতা এবং সত্য থেকে বিচ্যুতি আর কিছুই নয়। হযরত মোহাম্মদ (সা)কে পবিত্র কোরআনের রচয়িতা হিসেবে চিহ্নিত করা। অথচ হযরত মোহাম্মদ (সা) সব সময়ই বলে এসেছেন কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী, যা তাঁর নিকট নাযিল হয়েছিল। অথচ শত্রুরা বলে থাকে :

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ.

"এটাতো মানুষেরই কথা ছাড়া আর কিছু নয়"

(সূরা মুদদাসসির : ২৫ আয়াত)

অপর কথায় অবিশ্বাসীরা বলে থাকে হযরত মোহাম্মদই (সা) পবিত্র কোরআনের রচনাকারী। তিনি নিজের কথাকে আল্লাহ্‌র বাণীরূপে প্রচার করে ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ্)। ফলে কোরআন তাঁরই রচনা। তিনি এটাকে ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের নকল অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে রচনা করেছিলেন বলে তারা বিশ্বাস করে থাকেন।

আসুন, দেখা যাক বিশ্বের বিখ্যাত অমুসলিম লেখক ও ইসলামের সমালোচকগণ তাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই ভুলের আশ্রয় নিয়ে কিভাবে বলে থাকেন যে কোরআন হযরত মোহাম্মদের (সা) রচনা।

সূরা-মুদদাসসির, সূরা নং-৭৪
আয়াত নং–২৪ থেকে ৩০ পর্যন্ত

بسم الله الرحمن الرحيم.
فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ.

২৪। এবং বলল, এটাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ.

২৫। এটাতো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ.

২৬। শীঘ্রই আমি তাকে দোযখের আগুনে (সাকার) নিক্ষেপ করব।

وَمَآ اَدْرٰكَ مَاسَقَرُ.

২৭। তুমি কি জান সাকার কি?

لَاتُبْقِىْ وَلَاتَذَرُ.

২৮। তা তাদের জীবিতাবস্থায় রাখবে না এবং মৃত অবস্থায় ছেড়েও দেবে না

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ.

২৯। মানুষকে জ্বালিয়ে বিকৃত করে দেবে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

৩০। তার উপরে আছে উনিশ।

এই সূরার ৩০নং আয়াত পর্যন্ত নাযিল হওয়ার পর হযরত জিব্রাইল (আ) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। উল্লেখ্য, অবিশ্বাসীরা যে সকল অভিযোগ আনে তা ২৪ ও ২৫নং আয়াতে উল্লেখ আছে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা গিবণ তাঁর "ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব দ্যা রোমান এম্পায়ার" (Decline and Fall of the Roman Empire) এ ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে মতামত রাখতে গিয়ে বলেন!

"The creed of Muhammad is free from the suspicions of ambiguity, and the Quran is a glorious testimony to the unity of God."

অর্থাৎ "মোহাম্মদের ধর্মমত মতদ্ব্যর্থকতার সন্দেহ থেকে মুক্ত এবং কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি মহিমাময় সাক্ষ্য।" অথচ এই মহান ব্যক্তি অবিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।

বিগত শতাব্দির মহান চিন্তাবিদ টামস কার্লাইল তাঁর "হিরোজ এণ্ড হিরো ওরশিপ" (Heroes and Hero worship) গ্রন্থের বিশেষ শিরোনাম 'দি হিরো এজ প্রফেট' (The Hero as Prophet) এ হযরত মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

"*The word of such a man* is a voice direct from nature's own heart. Men do and must listen to that as to nothing else. All else is wind in comparison."

"অর্থাৎ এরূপ মহাপুরুষের বাণী প্রকৃতির হৃদয় থেকে সরাসরি উৎসারিত। মানব সমাজের এইসব বাণী শোনা এবং অনুসরণ করা ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। এগুলোর সাথে তুলনা করলে অন্যগুলো শুধু বায়বীয় পদার্থ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।"

এর অর্থ হলো হযরত মোহাম্মদ (সা) যা বলে গেছেন এবং কোরআনে যা আছে তার সাথে তুলনা করলে অন্যান্য মহাপুরুষের বাণী হচ্ছে 'রাবিশ বা আবর্জনা।'

রেভারেন্ড. আর. বসওয়ার্থ স্মিথ ছিলেন একজন খ্রীশ্চিয়ান পাদ্রী। তাঁর রচিত গ্রন্থ "মোহাম্মদ ও মোহামেডানিজম" (Muhamed And Muhamedanism) এ হযরত মোহাম্মদ (সা) এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন :

"Illiterate himself, scarcely able to read or write: HE WAS YET THE AUTHOR OF A BOOK, which is a poem, a code of laws, a book of common Prayers, and a Bible-All in one. And is reverenced to this day by a sixth of the whole human race as a miracle of purity of style, of wisdom and of truth. It is the one miracle claimed by Muhammad. His standing miracle he called it and a miracle indeed it is!"

"অর্থাৎ নিজে ছিলেন নিরক্ষর। আদৌ লিখতে বা পড়তে পারতেন না। অথচ তিনি ছিলেন একটি গ্রন্থের রচয়িতা। যা একটি কবিতা, একটি আইন, সর্বসাধারণের জন্য একটি প্রার্থনা এবং একটি বাইবেল– বলতে গেলে একের মধ্যে অনেক। পৃথিবীর ছয়ভাগের একভাগ মানুষ-এর

অলৌকিক বিশুদ্ধ পদ্ধতি, সত্য ও জ্ঞানের কারণে আজও ভক্তিভরে অনুসরণ করে। মোহাম্মদ দাবী করতেন এটা অলৌকিক এবং অলৌকিকত্বের উপর-এর অবস্থান এবং সত্যিই এটি একটি অলৌকিক গ্রন্থ।"

অথচ এই সমালোচক একজন ত্রিত্ববাদী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। "হিষ্ট্রী অব টারকস' (History of Turks) এর ফরাসী লেখক ও ইতিহাসবেত্তা লা মার্টিন সংক্ষেপে হযরত মোহাম্মদের (সা) প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"Philosopher, orator, Apostle, legislator, warrior, conqueror of Ideas, the restorer of rational beliefs, of a cult without images; the founder of twenty terrestrial empires and one spiritual empire- that is Muhammad. With regards all standards whereby human greatness may be measured, we may well ask, is there any man Greater than he?"

"একাধারে দার্শনিক, বক্তা, সমাজ সংস্কারক, আইন প্রণেতা, যোদ্ধা, নিজ আদর্শে বিজয়ী, বিচার বুদ্ধি পুনঃ প্রতিষ্ঠাকারী, অনুপম ধর্মের স্থপতি, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্যের এবং একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-এই হলো মোহাম্মদ। যেদিক থেকে মানুষের মহত্বের মান নির্ধারণ করা যায়, সেই দিক থেকে আমরা প্রশ্ন রাখতে পারি তাঁর চেয়ে মহান ব্যক্তি আর কে হতে পারেন?"

লেখক লা মার্টিন তার প্রশ্নের মাঝেই উত্তর রেখেছিলেন, "না, তার চেয়ে মহান ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না।" বাস্তবিক হযরত মোহাম্মদ (সা) ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে মহান ব্যক্তি। এতোসব প্রশংসা করার পরও এই সহৃদয় ফরাসী লেখক ইসলামের ছায়াতলে না এসেই মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৭৪ সালের ১৫ই জুলাই-এ প্রকাশিত 'টাইম' ম্যাগাজিনে আমেরিকার প্রখ্যাত মনঃসমীক্ষক জুলে ম্যাসারম্যান তাঁর 'হোয়ার আর দি লীডারস্' (Where are the leaders) অর্থাৎ 'নেতারা কোথায়' প্রবন্ধে ইতিহাসের বিভিন্ন মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রবন্ধের সর্বশেষ উপসংহারে উল্লেখ করেছেন, "বোধ হয় সর্বকালের জন্য মোহাম্মদ (সা) ছিলেন সবচেয়ে মহান নেতা।" (Perhaps the greatest leader of all times was Muhammad) সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, নিজে একজন ইহুদী হওয়া সত্ত্বেও

ম্যাসারম্যান তাঁর নবী হযরত মুসা (আ) কে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন। তাঁর বিচারে যীশু (হযরত ঈসা (আ) এবং বুদ্ধের স্থান অনেক নীচে।

আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ইতিহাসবেত্তা এবং গণিতশাস্ত্রবিদ মাইকেল এইচ হার্ট ৫৭২ পৃষ্ঠাব্যাপী 'দি হানড্রেড' (The Hundred) অর্থাৎ '১০০টি' অথবা সর্বোচ্চ ১০০ অথবা ইতিহাসের সবচেয়ে ১০০ মহান ব্যক্তি) গ্রন্থটি রচনা করেছেন। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্য থেকে হার্ট ইতিহাসের ১০০ জন মহান প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নির্বাচন করে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বইয়ে তিনি হযরত মোহাম্মদ (সা)-কে এই ১০০ জনের মধ্যে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। বিস্ময়করভাবে তিনি তাঁর নবী যীশুকে (হযরত ঈসা আ.) তাঁর বইয়ে তৃতীয় স্থানে স্থাপন করেছেন।

জর্জ বার্নাড'শ, জন ডেভেন পোর্ট, গান্ধির মতো আরো অনেক অমুসলিম প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন তা আমরা এখানে যোগ করতে পারি। তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন, "তিনি ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ব্যক্তি।" কেউ বলেছেন, "মোহাম্মদ লক্ষ জনের মধ্যে একজন।" আবার কেউ বলেছেন, "ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সফলকাম। বোধ হয় তাঁর মতো পৃথিবীতে আর কেউ জন্মাবে না।" এই সব উক্তি হযরত মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে সর্বতোভাবে সত্য।

কিন্তু অমুসলমানদের দ্বারা এই সব ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন মুসলমানদের জন্য একটি সমস্যার সৃষ্টি করে আর তা হলো, এতো সুন্দর সুন্দর উক্তির মাধ্যমে শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখানোর পরও কেন তারা হযরত মোহাম্মদের (সা) অনুসারী হলেন না, কেন তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন না?

প্রথম প্রথম আমি (মূল লেখক) মনে করেছি এইসব অমুসলমানরা ভণ্ড বা কপট। কিন্তু আমার বিচারে ভুল ছিল। কোরআন সম্পর্কে বর্তমানে নতুন নতুন বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কারের পর এইসব বিখ্যাত অমুসলমান লেখক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে আমার মত বদলাতে বাধ্য হয়েছি।

এ কথা সত্য যে তাঁরা হযরত মোহাম্মদকে (সা) তাদের অনেক নবীর চেয়ে উচ্চে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, তাঁরা মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন, ইসলাম ধর্ম হযরত মোহাম্মদের (সা)

তৈরী এবং ফলশ্রুতিতে কোরআনের রচয়িতা হচ্ছেন হযরত মোহাম্মদ (সা) (নাউযুবিল্লাহ্)।

ঐসব বিখ্যাত লেখকরা অনেকে সন্দেহজনক বা দ্ব্যার্থক উদ্দেশ্যে বলেছেন যে ইসলাম মোহাম্মদের ধর্ম আবার কেউবা চতুরভাবে উল্লেখ করেছেন যে পবিত্র কোরআন মোহাম্মদের (সা) রচনা। সামগ্রিকভাবে তারা বিচার করেছেন যে হযরত মোহাম্মদ (সা) ছিলেন একজন প্রতিভাশালী মানুষ।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারীর তালিকায় মাইকেল এইচ হার্টের কথাই ধরা যাক। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিকে হযরত মোহাম্মদ (সা) ছিলেন ইতিহাসের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। এই কথা বলে তিনি উপসংহার টেনেছেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করার কারণ হিসেবে মিঃ হার্ট বোধ হয় তার অবচেতন মনের একটি অভিব্যক্তি গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছেন। আর তা হলো :

"Moreover he is the author of the Moslem holy scriptures., The Quran, A collection of certain of Muhammed's insights that he believed had been directly revealed to him by Allah.

"এর পরেও তিনি ছিলেন মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ কোরআনের রচয়িতা। এটা মোহাম্মদের (সা) অন্তরদৃষ্টির কতকগুলো বাণী, যা তিনি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন বলে বিশ্বাস করতেন।"

এখানে 'কোরআনের রচয়িতা' শব্দগুলো, টমাস কার্লাইল এর 'এইরূপ মানুষের বাণী' এবং রেভারেন্ড আর, বসওয়ার্থ স্মীথের লেখা, 'তবুও তিনি একটি গ্রন্থের রচয়িতা। এইগুলো লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যাবে, কেন তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেননি। আল্লাহ্ তায়ালা এই জন্যেই অবিশ্বাসীদের উক্তি পবিত্র কোরআনের সূরা মুদদাসসির এর ২৫ নং আয়াতে তুলে ধরেছেন :

اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ.

"ইহা মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়"

অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের মতে পবিত্র কোরআন মানুষের রচনা।

পঞ্চম অধ্যায়

ইহার উপর আছে উনিশ

এইরূপ মিথ্যা অনুমানের উত্তরে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের সতর্ক করে দিয়েছেন, এই বলে :

سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ.

শীঘ্রই আমি তাদেরকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করব।
(সূরা মুদদাসসির : ২৬ আয়াত)

এই সতর্কীকরণ শেষ করেছেন ২৯নং আয়াতে এবং ৩০নং আয়াতে এসে বলেছেন :

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

"ইহার উপর আছে উনিশ'। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৩০ আয়াত)

অন্য কথায় বলতে গেলে এটাই দাঁড়ায় যে যদি কেউ হযরত মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ আনেন যে তিনিই কোরআনের রচয়িতা, তা'হলে তারা যেন অন্যান্য জিনিষের মধ্যে জেনে নেন 'ইহার উপর উনিশ' আরোপ বা স্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁকে উনিশ দ্বারা গণনা করতে হবে।

এই উনিশ কি?

কোরআন শরীফের পূর্বতন তাফসীরকারকগণ এই 'উনিশ' সংখ্যা সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর ধারণা করেছিলেন। কেউ বলেছেন, এই 'উনিশ' হচ্ছে দোযখ নিয়ন্ত্রণকারী উনিশজন ফেরেশতা।[৬] আবার কেউ বলেছেন, এই 'উনিশ হচ্ছে মানুষের ১৯টি ইন্দ্রিয় এবং অনেকে ইসলামের ১৯টি প্রধান স্তম্ভ বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন (এই প্রসঙ্গে মাওলানা আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী ও মাওলানা দরীয়াবাদীর ব্যাখ্যাগুলো দেখুন)। কিন্তু প্রত্যেক তাফসীরকারকগণই এই বলে তাদের কথা শেষ করেছেন যে, 'এই সম্পর্কে মহান আল্লাহই ভাল জানেন।'

৬ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৯০ সালে মুদ্রিত কোরআন শরীফে এই উনিশ সম্পর্কে দোযখের ১৯জন ফেরেশতার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। (অনুবাদক)

অর্থাৎ এই 'উনিশ' সংখ্যা সম্পর্কে মহান আল্লাহই ভাল জ্ঞাত আছেন। আমাদের তাফসীরকারকগণ কেউই এই 'উনিশ' সংখ্যার ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন গোঁড়ামী বা ঔদ্ধত্য বা নিশ্চয়তা প্রকাশ করতে পারেননি। অর্থাৎ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারেননি এই ১৯ সংখ্যাটিতে কি বোঝায়? কারণ আমাদের নবী এই 'উনিশ' সম্পর্কে আসল অবস্থা বর্ণনা করেননি। যদি তিনি এই 'উনিশ' সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে যেতেন, তাহলে আমাদের অনুমান বা আন্দাজ করার কোন অবকাশ থাকতো না।

'উনিশ' হচ্ছে একটি সংখ্যা। আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগে আরবদের কাছে এর আর কি-ই বা অর্থ থাকতে পারে। অর্থ একটাই, ১০+৯=১৯ ছাড়া আর কিছুই নয়। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় থেকে আজ, এই চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত এই 'উনিশ' সংখ্যাটি কি অর্থ বহন করতে পারে? কিছুই না। 'উনিশ' এখনও 'উনিশ'ই থেকে গেছে অর্থাৎ ১০+৯=১৯।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সংখ্যা তাদের নিজস্ব সংখ্যা তাত্ত্বিক মূল্য ছাড়াও বিভিন্ন মৌলিক অর্থের অতিরিক্ত তাৎপর্য প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ৭৮৬। আফ্রিকার যে কোন মুসলমান শিশুকেও জিজ্ঞেস করুন ৭৮৬ এর অর্থ কি? সে কোন ইতস্ততঃ না করেই উত্তর দেবে ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم.

করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

এটা কিভাবে সম্ভব হলো? প্রয়োজনে পরে ব্যাখ্যা দেয়া যাবে। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে হিব্রু এবং আরবী ভাষার অক্ষরগুলোকে ঐতিহ্যগতভাবে প্রত্যেকটির একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক মূল্য দেয়া হয়েছে। যদি উল্লেখিত 'বিসমিল্লাহর' অক্ষরগুলোকে সংখ্যাতাত্ত্বিক মূল্য হিসেবে যোগ করা হয় তাহলে এর যোগফল হবে ৭৮৬। সুতরাং ৭৮৬ হচ্ছে 'বিসমিল্লাহর' সংখ্যাতাত্ত্বিক যোগফল।[৭]

দক্ষিণ আফ্রিকার কোন বাড়ীর ফ্লাটের নম্বর ১, ২, ৩ এগুলো দিয়ে গণনা করা হয়। যখন ১২ এর পরে ১৩ আসার কথা, সেখানে অনেকে ১৩ এর পরিবর্তে ১২ক, ১৪, ১৫, ১৬ এই সব নম্বর ব্যবহার করে। তবে তারা কি ১৩ সংখ্যাটি লিখতে জানে না? আমরা সবাই জানি কিছু লোক আছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তারা ১৩ সংখ্যাটিকে 'অপয়া' বা 'মনহুছ' মনে করে। অনেকে ১৩ নম্বর ফ্লাটে বাস করতে

৭ আমাদের বাংলাদেশেও মুসলমানদের মধ্যে "বিসমিল্লাহর" সংখ্যা তাত্ত্বিকরূপ ৭৮৬ বহুল পরিচিত। (অনুবাদক)

চায় না বলে ১৩ নম্বর বাদ দিয়ে ১২ক লিখে থাকেন। কিন্তু ১৩ তারিখ যদি শুক্রবার হয় তাহলে? অনেক দেশে এটাকে অপয়া দিন বলে মনে করে। আমরা যদি কোন বিষয় বা বস্তুকে বলি থার্ড ক্লাস, তাহলে বুঝতে হবে বিষয়টি খুব খারাপ। যদি বাইবেলে বর্ণিত নম্বর ৬৬৬ হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটা পশুর চিহ্ন। ভারত এবং পাকিস্তানে আপনি যদি কাউকে চোর, বাটপার, ঠক, জুয়াচোর বলে আখ্যায়িত করতে চান, তাহলে কি বলে থাকেন? বলা হয় লোকটি ৪২০। কারণ ঐ সব দেশের আইনের ধারা অনুযায়ী লোকটিকে ৪২০ ধারায় অভিযুক্ত করা যায়। ঠিক এইরূপ ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অক্ষরগুলোর এক একটি সংখ্যা তাত্ত্বিক মূল্য থাকে।

এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যে বিশ্বের মুসলমানরা গত ১৪০০ বছর এই 'উনিশ' সংখ্যাটির কোন দ্বিতীয় অর্থ না জেনেই পড়ে আসছে। পবিত্র কোরআনে লিখিত এই 'উনিশ' সংখ্যাটিকে কেউ কলুষিত করতে পারেনি। এটা 'উনিশ'ই ছিল, আজ পর্যন্ত 'উনিশ'ই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। "মোহাম্মদ (সা) কোরআনের রচয়িতা" এর জবাবে এই 'উনিশ' সংখ্যাটি আল্লাহ্ প্রদান করেছেন। পবিত্র কোরআনের আসল রচয়িতা মহান আল্লাহ এই 'উনিশ' সংখ্যাটিতে একটি ইংঙ্গিত দিয়েছেন। যদি হযরত মোহাম্মদ (সা) কোরআন রচনা করে থাকতেন তবে তিনি অবশ্যই জানতেন যে এই 'উনিশ' সম্পর্কে তিনি কি বলতে চাইছেন।

আমরা সত্য বলে জানি যে কোরআনের বাণীসমূহ আল্লাহর বাণী, যা হযরত মোহাম্মদের (সা) কাছে ওহী হিসেবে আসত। হযরত মোহাম্মদ (সা) সবসময় তাই বলতেন এবং দাবী করতেন। কোরআনেও তা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى.

৩। তিনি (মোহাম্মদ) নিজের থেকে কিছু বলেন না।

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى.

৪। ইহা ওহী যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى.

৫। তাহাকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী কর্তৃত্ব। (সূরা নাজ্‌ম : ৩/৫ আয়াত)

এবং তিনি (হযরত মোহাম্মদ (সা)) বারে বারে লোকজনদের এই কথাই বলে এসেছেন :

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ.

১১০। বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।

يُوْحَىٰٓ اِلَيَّ.

(কিন্তু) আমার কাছে প্রত্যাদেশ আসে যে

اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

তোমার ইলাহ-ই একমাত্র ইলাহ্। (সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ১১০)

বিশ্বের মুসলমানরা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে কোরআন আল্লাহ্র বাণী এবং হযরত মোহাম্মদ (সা) কোরআনের রচয়িতা নন। এমনকি এর মধ্যে একটি অতিরিক্ত শব্দও তিনি নিজে অন্তর্ভুক্ত করেননি বা বাদ দেননি।

কোরআনের সমালোচকরা এবং যারা বলে থাকেন কোরআন মোহাম্মদের রচনা-যুক্তির খাতিরে আমরা তাদের সাথে একমত হয়ে খুব শীঘ্রই প্রমাণ করতে পারব যে কোরআন মোহাম্মদের (সা) রচনা নয়। পবিত্র কোরআন হচ্ছে একটি বিশেষ অলৌকিক গ্রন্থ। এর রচনা সম্পূর্ণভাবে মানুষের কল্পনাশক্তির বাইরে।

কোরআন নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে আমরা দেখতে পাই যে সূরা মুদ্দাসসির এর ৩০নং আয়াতটি ৪র্থ বারের সময় হযরত মোহাম্মদের নিকট নাযিল করা হয়।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

ইহার উপর আছে উনিশ

সূরা মুদ্দাসসির এর ৩০টি আয়াত নাযিলের পর আগেই বলা হয়েছে, হযরত জিব্রাইল (আ) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন এবং এই সূরার বাকী ২৬টি আয়াত নাযিল করা হলে সূরাটি সম্পূর্ণ হতো। নীরবতার পর তিনি ফিরে যান সেই সূরা আল-আলাকে, যার ৫টি আয়াত সর্ব প্রথম নাযিল করা হয়েছিল। সূরা আল-আলাকের বাকী ১৪টি আয়াত এই সময় নাযিল করা হলো। তাহলে প্রথম নাযিল হওয়া সূরাটিতে আমরা কতগুলো আয়াত পাচ্ছি? উত্তর হবে 'উনিশ' (৫+১৪=১৯)। তা হলে কোরআনে নাযিলকৃত 'উনিশ' শব্দটি বলার পর ১৯ আয়াত সম্বলিত সূরা কিভাবে সম্পূর্ণ করা হলো! অবিশ্বাসীরা হয়তো বলবে এটা হঠাৎ ঘটে গিয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'কোইন্সিডেন্স'।

ঠিক আছে। সূরা আল-আলাকের যে পাঁচটি আয়াত ১ম নাযিল করা হয়েছিল, গণনায় দেখা যাবে তার শব্দ সংখ্যা ১৯ অর্থাৎ ১৯×১=১৯। এটা কিভাবে ঘটলো? এটাও কি 'কোইন্সিডেন্স' বা হঠাৎ ঘটে গিয়েছে? আরো এগিয়ে ঐ ১৯টি শব্দের অক্ষরগুলোর যোগফল দাঁড়াচ্ছে ৭৬, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ ১৯×৪=৭৬। এটাও কি...। এবার দেখা যাক, সূরা আল-আলাক হচ্ছে বর্তমান কোরআন শরীফের ৯৬ তম সূরা। পেছন থেকে গণনা করলে ১১৪, ১১৩, ১১২, ১১১ এইভাবে গুনলে দেখা যাবে সূরাটির সংখ্যা ১৯ (শেষ দিকের গণনা অনুযায়ী)। এটা কিভাবে ঘটলো যে একটি সূরা যার ১৯টি আয়াত এবং শেষ দিকের গণনা অনুযায়ী ১৯নং সূরা হিসেবে কোরআনে লিপিবদ্ধ করা হলো? এটা কিভাবে সম্ভব?

যখন কোন লেখক কোন গ্রন্থ রচনা করতে যান তিনি মনে মনে একটি পরিকল্পনা করে নেন। তবে কেউ মনে মনে এই পরিকল্পনা ২৩ বছর ধরে লালন পালন করতে পারেন কি? পারেন না। যদি মোহাম্মদ (সা) কোরআন লিখে থাকেন, তাহলে তাঁর মনেও এরূপ কোন পরিকল্পনা ছিল। তাহলে তাঁকে হয়তো বলতে হতো (কথার কথা), "দেখ আমি একটি বড় গ্রন্থ রচনা করতে যাচ্ছি। এটা লিখে শেষ করতে আমার ২৩টি বছর লাগবে। আমি এই বইটি বিভিন্ন সূরায় বা অধ্যায়ে লিখে যাব, যা আমার উম্মতগণ অনুসরণ করবে।" এইসব কথার ওপর অনুমান করা যাক, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই বইটিতে ১১৪টি সূরা থাকবে। ১১৩টি নয়, ১১২টি নয়, তবে ১১৪টি কেন? ধরে নেয়া যাক যেহেতু ১১৪ সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য, সেহেতু তিনি ১১৪টি সূরাই রচনা করবেন। তিনি কি বলেননি, 'ইহার উপর আছে উনিশ' দ্বারাই কোরআনকে আবদ্ধ করবো। এটা কিভাবে ঘটলো যে কোরআনের ১১৪টি সূরাই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৯×৬=১১৪)।

অবিশ্বাসীরা হয়তঃ বারে বারেই বলবে, হঠাৎ ঘটে গিয়েছে অর্থাৎ 'কোইন্সিডেন্স'। তাদের কি এই বিস্ময়কর অবস্থা ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য আর কোন ভাষা নেই? বোধ হয় নেই। যখন কোন ঘটনা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না, তখন নিজেকে প্রবোধ দেয়ার জন্য বিভিন্ন কথার অবতারণা করা হয়ে থাকে। এটাই মানুষের দুর্বলতা। আর এই কারণেই অবিশ্বাসীরা হযরত মোহাম্মদের (সা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে বলেছে "মোহাম্মদ (সা) কোরআন রচনা করেছেন।" কিন্তু ১৪০০ বছর আগে মরুভূমির একজন নিরক্ষর ব্যক্তি কোন কাগজ ও কলম ছাড়াই জটিল গাণিতিক বুননের ভিত্তিতে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করতে পারেন, এই সম্মানটুকুও অবিশ্বাসীরা তাঁকে দিতে প্রস্তুত নয়।

ইতিপূর্বে আমরা ১৯ সংখ্যা দ্বারা কোরআন প্রণয়ন সম্পর্কে ৫টি উদাহরণ দিয়েছি। হযরত মোহাম্মদ (সা) এই অসম্ভব কাজ করতে পারেন না বলে অবিশ্বাসীরা যেহেতু স্বীকার করবে না, সেইহেতু আমরা কোরআনকে সামগ্রিক ভাবে 'উনিশ' সংখ্যার দ্বারা বিশ্লেষণ করব। আমরা এই ক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদের সাথে একমত হতে পারি যে, ১৯ সংখ্যার ওপর ভিত্তি করলে হযরত মোহাম্মদ (সা) কোরআনের রচয়িতা হতে পারেন না।

হযরত মোহাম্মদ (সা) -এর বন্ধু এবং শত্রুরা সবাই একমত যে তিনি ছিলেন এক কথার মানুষ। তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির বহু আগে তাঁর পৌত্তলিক দেশবাসীরা তাঁকে আস-সাদিক, আল ওয়াদ-আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, সৎ এবং বিশ্বাসী। এই মানুষ মোহাম্মদ (সা) যখন বলেন, 'ইহার উপর আছে উনিশ'। উনিশ দ্বারা তোমাদের গণনা করতে হবে, তাহলে অবশ্যই তিনি তাঁর কথা রাখতেন। দেখা যাক বৃহত্তর পরিসরে হযরত মোহাম্মদ (সা) তাঁর কথা কতটুকু রক্ষা করেছিলেন।

কথার কথায় যদি ধরে নেয়া হয় যে, মোহাম্মদ (সা) হয়ত বলেছিলেন যে, "আমি এমন একটি কিতাব রচনা করব, যা হবে পৃথিবীতে একটি মাত্র অপূর্ব গ্রন্থ। এরূপ কোন গ্রন্থ এর আগে রচিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। বইটি রচিত হবে গাণিতিক বুননে। অর্থাৎ বইটিকে ভেজাল বা নকল থেকে রক্ষার জন্য গাণিতিক বুননে রচনা করা হবে। কোন মানুষ এর মধ্যে কোন অক্ষর, শব্দ বাক্য যোগও করতে পারবে না, বাদও দিতে পারবে না এবং সম্পূর্ণ বইটি ১৯ সংখ্যার দ্বারা আবদ্ধ করা হবে।"

তাহলে ১৯ সংখ্যাটি কেন? এই সংখ্যার দ্বারা কি কাজ করা সম্ভব। এটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন সংখ্যা যা দ্বারা কাজ করা খুব কঠিন। কারণ এই সংখ্যাটি অন্য কোন সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য নয়। যেমনটি হয়ে থাকে ১৮, ২০ বা ২১ এর ক্ষেত্রে যা ৩, ৪, ৫ বা ৭ দ্বারা বিভাজ্য।

'উনিশ' সত্যই অংকশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। একটি দুর্লভ অনুপম সংখ্যা যার শুরু অঙ্কশাস্ত্রের নিম্নতম অংক 'এক' দিয়ে এবং শেষ হচ্ছে সর্বোচ্চ অংক 'নয়' দিয়ে। বোধ হয় হযরত মোহাম্মদ (সা) ১৯ এর নামতা জানতেন। বলে রাখা ভাল যে পৃথিবী বিখ্যাত গণিতবিদ আইনষ্টাইন নাকি ১৯ এর নামতা মনে রাখতে পারতেন না। আমরা যদি ধরে নেই যে হযরত মোহাম্মদ (সা) কোরআনের রচয়িতা তাহলে আমরা দেখতে পাবো তিনি ১৯ সংখ্যার অবস্থান কোরআনে কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণনা ও শতাব্দীসমূহ

ধরা যাক মোহাম্মদ (সা) তাঁর বইটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিতে গিয়ে স্থির করলেন যে তাঁর বই এর প্রথম বাক্যটি ১৯টি অক্ষর দিয়ে তৈরী করবেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন মানুষ আছে কি, যিনি পুনঃপুনঃ চেষ্টা ছাড়া একটি বই এর প্রথম বাক্যটি ১৯টি অক্ষর দ্বারা তৈরী করতে পারেন। চেষ্টা করতে গেলে কয়েকবার ভুল হবেই। এইভাবে কোন বাক্য তৈরী করতে গেলে আপনাকে আমাকে অনেক চিন্তা করে মনের মধ্যে কতগুলো বাক্য তৈরী করতে হবে। প্রথমেই যে সব বাক্য মনে আসবে 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা' অথবা 'একদা কোন এক সময়' এইগুলো। আপনাকে প্রথম বাক্যগুলো লিখে পরে অক্ষরগুলো গুণতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এমনও হতে পারে যে আপনার বই এর জন্য ১৯ অক্ষর দ্বারা গঠিত প্রথম বাক্যটি আপনার জীবদ্দশায় তৈরী নাও হতে পারে। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সা) সঠিক লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানলেন অর্থাৎ ১৯টি অক্ষর দ্বারা প্রথম বাক্যটি তৈরী করলেন। তিনি শুরু করলেন (এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা ধরে নিয়েছি মোহাম্মদ (সা) কোরআন রচনা করেছেন) :

بسم الله الرحمن الرحيم.

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

আরবী অক্ষরগুলো গুনে দেখুন, ঠিক ১৯টি অক্ষর অর্থাৎ ১৯×১=১৯ গণনার সুবিধার জন্য অপর পৃষ্ঠায় একটি চিত্র দেয়া হলো। এই বিষয়ে আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার পূর্বে গুণে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করে নিন। এটা কিভাবে ঘটলো? অবিশ্বাসীরা (নাস্তিকরা) কি এটাকেও কোন 'কোইন্সিডেন্স' বলবেন? হয়ত বলতে পারেন। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সা) কি বলেননি 'ইহার উপর আছে 'উনিশ'। অর্থাৎ উনিশ দ্বারা আপনাকে আবদ্ধ করা হয়েছে। উনিশ দ্বারা গণনা করতে হবে।
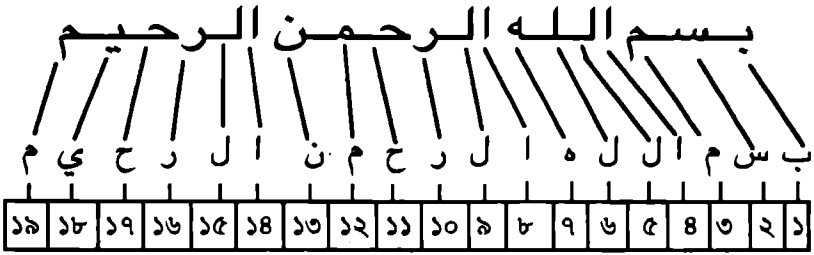
ধরে নেয়া যাক, ১৯টি অক্ষর দ্বারা কোন বইয়ের প্রথম বাক্যটি তৈরী করতে কোন কষ্ট হয়নি হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর। তিনি হয়তো বলতে পারেন, "আমি যা করতে যাচ্ছি তাহলো প্রথম বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দকে আমার বইয়ে এমনভাবে স্থাপন করবো, যা ১৯ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য। আমাদের গ্রন্থকার (?) এই অসাধ্য কিভাবে সাধন করেছিলেন তা জানার জন্য আমরা পবিত্র কোরআনকে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি। কোরআনের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য এই ১৯ সংখ্যার দ্বারা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করতে আমাদের সময় ও ধৈর্যের অভাবে দেখা দিতে পারে বলে আমরা কম্পিউটারের সাহায্য নিয়েছি। দেখা যাক বিশ্লেষণ করে আমরা কি পেয়েছি।

এই আরবী বাক্য .بسم الله الرحمن الرحيم এর প্রথম শব্দ اسم পবিত্র কোরআনে ১৯ বার উল্লেখ করা হয়েছে (১৯×১=১৯) এটা কিভাবে ঘটলো? যাক, পরবর্তী শব্দ الله। কোরআনে ২৬৯৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। আপনার ক্যালকুলেটার নিয়ে ভাগ করুন। দেখা যাবে ১৯×১৪২=২৬৯৮। এটাই বা কিভাবে ঘটলো? এর পরের শব্দ الرحمن। উল্লেখ করা হয়েছে মোট ৫৭ বার অর্থাৎ ১৯×৩= ৫৭। এবার আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে নিশ্চয়ই অলৌকিক কিছু একটা ঘটছে। এর পরের শব্দ الرحيم। ১১৪ বার (১৯×৬=১১৪) উল্লেখ করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। এটা কি ভাবে ঘটলো? এতগুলো ঘটনা কি একই বিষয়ে হঠাৎ করে ঘটে যেতে পারে? মোটেই নয়। তাহলে অলৌকিকত্বই হচ্ছে পবিত্র কোরআনের প্রধান উপাদান। এটা কোন মানুষের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। এমন কি হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর পক্ষেও নয়।

শেষ শব্দ الرحيم। অর্থাৎ পরম দয়ালু শব্দটি পবিত্র কোরআন শরীফের ১১৪টি সূরার সাথে সঙ্গতি রেখেই ১১৪ বার পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে

হয় আল্লাহ্ যে পরম দয়ালু এই কথা প্রত্যেকটি সূরার জন্য الرحيم। শব্দটির মাধ্যমে ভাগ করে দেয়া হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم.

এর প্রত্যেকটি শব্দ সঠিক সংখ্যায় নীচের ধারা অনুযায়ী পবিত্র কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে।

১৯ বার = (১৯×১)	اسم
২৬৯৮ বার = (১৯×১৪২)	الله
৫৭ বার = (১৯×৩)	الرحمن
১১৪ বার = (১৯×৬)	الرحيم

পবিত্র কোরআনের এইরূপ অবস্থা বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে একজন নিরক্ষর বা 'উম্মী' হিসেবে হযরত মোহাম্মদের (সা) পক্ষে কাগজ, কলম, ক্যালকুলেটার ও কম্পিউটার ছাড়া এই জটিল গাণিতিক বুননের কাজ করা কখনই সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সব সময়ই দাবী করতেন কোরআন আল্লাহ্র বাণী।

কিন্তু আল্লাহ্র তরফ থেকে নাযিলকৃত কিতাবের সত্যতার যথার্থ প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন প্রত্যেকটি দলিল বা পত্রের সত্যতার জন্য এর আসল বা মূল স্থানের একটি সীলমোহর থাকে। যেমনটি থাকে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের। পাসপোর্টের মধ্যে এম্‌বস্‌ করা সীলমোহর থাকে, যাতে এটাকে কেউ নকল করতে না পারে। সেরূপ আল্লাহ্র কালামেরও সীলমোহর থাকা প্রয়োজন, যা থেকে বোঝা যেতে পারে যে পবিত্র কোরআন আল্লাহ্র বাণী এবং মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ। আর এই ব্যবস্থা হলো :

بسم الله الرحمن الرخيم.

এই বাক্যটি সরাসরি লিখিত হতে পারে অথবা কোন কিছুর মধ্যে খোদাই করাও হতে পারে। কাঠ, রাবার অথবা ধাতুর ওপরও খোদাই করা যেতে পারে। পবিত্র কোরআনের ১১৪টি সূরার জন্য ১১৪টি এই উপরোক্ত সীলমোহর 'বিসমিল্লাহ' থাকার কথা। প্রত্যেকটি সূরার জন্য একটি 'বিসমিল্লাহ'। এমনকি যারা আরবী জানেন না তারাও এই সীলমোহরটি দেখলে চিনে নিতে পারবেন। যা আল্লাহ কোরআনে প্রত্যেকটি সূরার আগে স্থাপন করে দিয়েছেন। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে কোরআনের ৯ নম্বর সূরায় (সূরা তওবা) এসে দেখা গেলো এই 'বিসমিল্লাহ' সীলমোহরটি নেই। এই না থাকার কারণে একটি বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে।

১১৪টি সীলমোহর — ১১৪টি সূরা

بسم الله الرحمن الرحيم

কিন্তু ৯নং সূরার (সূরা তাওবা)

বিসমিল্লাহ?

بسم الله الرحمن الرحيم
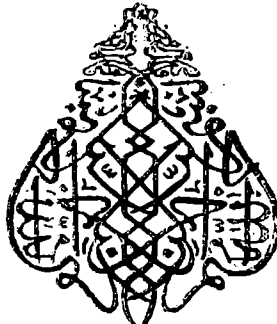
সূরা নং-৯ : আত্‌তাওবা

প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে বিস্‌মিল্লাহ্‌ থাকার কথা

? ? ? ? ? ?

١- بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

٢- فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ.

٣- وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

পবিত্র কোরআনে এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম যে সূরায় –

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নেই।

অর্থাৎ সীলমোহরটি নেই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. সমস্যার সৃষ্টি হলো–১১৪টি সূরা কিন্তু ১১৩টি عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. "ইহার উপর আছে উনিশ" এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। সমস্যাটি হলো ১১৪টি সূরা অথচ সীলমোহর মাত্র ১১৩টি এবং ১১৩ কখনই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকার মহান আল্লাহ বলেছেন তোমাদেরকে ১৯ দ্বারা গণনা করতে হবে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

"ইহার উপর আছে উনিশ"

এই অসীম সৌন্দর্যমণ্ডিত সমস্যাটিকে অতিক্রম করার সুন্দর ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা নিজেই করেছেন। নিজের সৃষ্ট সমস্যাকে নিজেই সুন্দর ভাবে সমাধান করেছেন। দেখা যাক প্রথমে এই সমস্যা সূরা নং-৯ এ (সূরা তওবা) কিভাবে তৈরী করা হয়েছে?

আগেই বলেছি সূরা-৯ এর নাম হচ্ছে সূরা তওবা। যার অর্থ দাড়ায় "গুনাহর জন্য অনুতাপ"। এই সূরার মুশরিকদের জন্য বা অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ চরমপত্র প্রদান করেছেন, যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েও সেই চুক্তি নিজেরা ভঙ্গ করে। এর প্রেক্ষিতে ৩নং আয়াতটি দেখুন :

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

আমি অবিশ্বাসীদের জন্য ঘোষণা করছি কঠিন শাস্তির। (সূরা তওবা : আয়াত-৩)

বিজ্ঞজনেরা এবং জ্ঞানীরা বলে থাকেন আল্লাহ যখন এইরূপ ভয়ানক সাবধান বাণী প্রদান করেন। তখন আয়াতটিতে করুণা বা দয়া প্রদর্শনের আশাব্যঞ্জক উক্তি যথোপযুক্ত নয়। যখন একদল অন্য দলের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে তখন বিরুদ্ধ দল চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে সাবধান ও চরমপত্র দিতে গিয়ে কখনও করুণা ও দয়ার কথা বলে না, এটাই মানব সমাজের নিয়ম। একজন কখনও এই ভাবে কথা বলে না" -আমি খুব সদয়, মহানুভব এবং ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি। কিন্তু তুমি আমার পাওনা টাকা ফেরত না দিলে আমি তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবো।" খুবই যুক্তিসংগত কথা। কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। অর্থাৎ ১১৪টি সূরার জন্য ১১৩টি বিসমিল্লাহ?

প্রকৃতপক্ষে একটি সূরায় বিসমিল্লাহ সীলমোহর কম। আমাদের গ্রন্থকার মহান আল্লাহ এই সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চই বিস্মৃত ছিলেন না। দেখুন, তিনি নিজের তৈরী করা সমস্যার কিভাবে সমাধান করলেন।

এক বিরাট মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আল্লাহ এক বিরাট গণিতশাস্ত্রকার হিসেবে তাঁর নিজস্ব সমাধান আমাদের জানিয়ে দিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

গ্রন্থকার কোন মানব নয়

কোরআন শরীফের সূরা নম্বর-২৭, সূরা 'নামল' এর ২৯নং আয়াতে মহান আল্লাহ অতি সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানী হযরত সোলায়মান (আ) এবং শিবার রাণী বিলকিসের কাহিনীর অবতারনা করলেন। হযরত সোলায়মান (আ) শুধু বিশ্বব্যাপী জ্ঞানী বাদশাহ্ বলে পরিচিত ছিলেন না, তিনি আল্লাহর নবীও ছিলেন। তাঁর নিকটবর্তী একটি দেশে একজন সদাশয় রাণী রাজত্ব করতেন। কিন্তু তিনি ও তাঁর প্রজারা ছিলেন "মুশরিক"-সূর্যের উপাসনা করতেন। এই রাণীর নাম ছিল বিলকিস। হযরত সোলায়মান (আ) রাণী বিলকিস এবং তাঁর প্রজাদের আত্মার উন্নতির জন্যে একটি চিঠি লিখে রাণীর নিকট পাঠালেন। রাণী বিলকিস পত্রটি সম্মানের সাথে গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর প্রজারা স্বতঃপ্রবৃত হয়ে আল্লাহর ধর্ম গ্রহণে হযরত সুলায়মানের (আ) এই দাওয়াতকে কিভাবে কবুল করবে? রাণী তাঁর প্রজাদের মনের খবর জানতেন। যদি তাঁর দেশের প্রধান ব্যক্তিরা এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে তাঁদেরকে 'হ্যাঁ' বলানোর আর কোন পথ থাকবে না। রাণী দরবার বসালেন। দেশের মন্ত্রী ও প্রধান ব্যক্তিদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

٢٩- قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ كَرِيمٌ.

২৯। সেই নারী বললো, হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে,

٣٠- إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.

৩০। তা সুলায়মানের নিকট থেকে এবং এটা এই : পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি,

٣١- أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ.

৩১। অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট হাজির হও। (সূরা নামল ঃ আয়াত ২৯-৩১)

৩০নং আয়াতে 'বিসমিল্লাহ' দেখুন। এই বিসমিল্লাহ-এর কারণে পবিত্র কোরআনের ১১৪টি সীলমোহর পূর্ণ করা হলো। এ ছাড়া আরো পূর্ণ হলো :

ক. ১৯×১ = ১৯টি   اسم

খ. ১৯×১৪২ = ২৬৯৮টি   الله

গ. ১৯×৩ = ৫৭টি   الرحمن

ঘ. ১৯×৬ = ১১৪টি   الرحيم

অতিশয় নিপুণতার সাথে আমাদের গ্রন্থকার মহান আল্লাহ্ ২৭নং সূরার মাঝখানে এই বিসমিল্লাহ যোগ করে কোরআনের ১১৪টি সীলমোহর সম্পূর্ণ করলেন।

بسم الله الر حمن الرحيم.

একই সময়ে এই তিনটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলোও সম্পূর্ণ করলেন :

১. প্রতিটি সূরার জন্য ১টি করে সর্বমোট ১১৪টি বিসমিল্লাহ্ সীলমোহর স্থাপন করলেন।

২. আল্লাহ্ দুনিয়ার প্রভুদের শিক্ষা দিলেন :

  ক. কখনও উদ্ধত ও অহংকারী হবে না।

  খ. পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নিজেদের বিষয়ে মীমাংসা করবে।

  গ. বাণী গ্রহণে অধস্তনদিগকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখবে।

৩. যখন লিখবে, মহান প্রভু আল্লাহ পরম করুণাময় ও দয়ালুর সামনে বসে লিখছ বলে মনে করবে, কারণ তিনি তোমার মনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত আছেন।

৪. এমনকি পৃথিবীর এক বাদশাহ্র নিকট থেকে অপর বাদশাহ্র নিকট কোন বাণী পাঠানো হলেও তিনি যতই শক্তিশালী হোন না কেন, আল্লাহ্র নজরে বিনয়ী হয়ে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করবে। এবং

৫. এর দ্বারা আমাদের গ্রন্থকার মহান আল্লাহ নিম্নে লিখিত কাজগুলো সম্পাদন করলেন :

  ক. ১৯টি   اسم   শব্দ পবিত্র কোরআনে স্থাপন করলেন।

  খ. ২৬৯৮   الله   শব্দ পবিত্র কোরআনে স্থাপন করলেন।

গ. ৫৭টি الرحمن। শব্দ পবিত্র কোরআনে স্থাপন করলেন।

ঘ. ১১৪টি الرحيم। শব্দ পবিত্র কোরআনে স্থাপন করলেন।

সূরা 'নামল' এর মাঝখানে বর্ণিত বিসমিল্লাহ না থাকলে কোরআনের প্রতিটি সূরার জন্য একটি করে বিসমিল্লাহ হতো না। একটির অভাব থাকতো। সেই সাথে উপরোক্ত শব্দগুলোরও একটি করে অভাব থাকতো। কেউ চিন্তা করতে পারেন কি, মরুভূমির একজন নিরক্ষর বাসিন্দা কোন কাগজ কলম ছাড়া ২৩টি বছর এইসব গণনা মনের মধ্যে ধরে রেখেছিলেন? আল্লাহ শব্দটি ২৬৯৮ বার ধরে রাখতে পারেন? তিনি কি দেখতে পেয়েছিলেন যে ২৬৯৮টি 'আল্লাহ' শব্দ ১৯ দ্বারা বিভাজ্য? যদি ধরা যায় হযরত মোহাম্মদ (সা) এই গাণিতিক বুননের কাজগুলোর দ্বারা কোরআন শরীফ রচনা করেছেন, তাহলে পৃথিবীর অন্য কোন কাজ তাঁর দ্বারা করা সম্ভব হতো না।

অপর দিকে হযরত মোহাম্মদ (সা) ছিলেন ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যস্ততম মানুষ। এই বইয়ের ৩৫ পৃষ্ঠায় হযরত মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে লা মার্টিনের উদ্ধৃতি দেখুন। তাঁর পৌত্তলিক দেশবাসীরা তাঁর সংস্কারের প্রতি ভয়ানক বিরুদ্ধাচরণ করেছিল; মদীনার ইহুদী, খ্রীস্টিয়ান ও মোনাফেকরা তাঁকে এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এইসব প্রতিবন্ধকতা, বাধা বিঘ্ন দূর করে তিনি কিভাবে কোরআনের এই জটিল গাণিতিক বুনন মনে রাখতে পারেন– অথচ তিনি মোটেই লেখাপড়া জানতেন না?

যতদূর সম্ভব এ পর্যন্ত কোরআনের গাণিতিক বুনন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর কালাম হিসেবে কোরআন একটি অনবদ্য কিতাব। পবিত্র কোরআন যে আল্লাহর কিতাব বা কালাম, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ দেয়া সম্ভব। নিঃসন্দেহে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই সম্পর্কে আরো অনেক কিছু দিতে পারেন। তবে কোরআনের গাণিতিক বুনন সম্পর্কে যেহেতু আমরা বিশ্লেষণ করছি। সেই হেতু বিষয়টির গভীরে আরো যেতে পারি।

পৃথিবীতে পবিত্র কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার অনেকগুলো সূরা বা অধ্যায়ের শুরুতে কিছু কিছু চিহ্ন আছে বা 'কোড' শব্দ আছে যাকে আরবীতে 'মুকাত্তায়াত' বা সাংকেতিক অক্ষর বলা হয়। বাইরের দিক থেকে এই সাংকেতিক অক্ষরগুলো কোন অর্থ বহন করে না।

আরবী ভাষায় মোট ২৮টি বর্ণমালা বা অক্ষর আছে। এই অক্ষরগুলোর মধ্য থেকে ১৪টি অক্ষর কখনও এককভাবে আবার কখনও মিলিতভাবে কোরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে 'মুকাত্তায়াত' বা সাংকেতিক অক্ষর হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'মুকাত্তায়াত' বা সাংকেতিক অক্ষর সম্বলিত সূরা কোরআনে ২৯টি আছে।

এবার দেখা যাক কি হয়। ১৪টি অক্ষর+১৪টি 'মুকাওয়াত'+২৯টি সূরা = ফলাফল ৫৭, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৯×৩)।

১৪টি 'মুকাত্তয়াত' কখনও একবার, কখনও দুইবার, তিনবার অথবা চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এককভাবে ব্যবহৃত একটি মুকাত্তয়াত "ن" এর কথা ধরা যাক। "ن" অক্ষরটি সূরা আল কালাম অর্থাৎ ৬৮ নং সূরার 'মুকাত্তয়াত' অর্থাৎ সাংকেতিক অক্ষর হিসেবে শুরুতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইরূপ সাংকেতিক অক্ষর সম্পর্কে মাওলানা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর ব্যাখ্যা ৫৫৯২ নোট দেখা যেতে পারে।

যেহেতু কোরআনের অলৌকিক প্রকৃতির জন্য আমরা ১৯ সংখ্যাটিকে আমাদের আবিষ্কারের ফল হিসেবে চিহ্নিত করেছি, সেইহেতু "ن" অক্ষর যা সূরা আল কালামের প্রথম সাংকেতিক অক্ষর-ঐ সূরায় কতবার ব্যবহার করা হয়েছে গণনা করা যাক। গণনায় দেখা যাবে "ن" অক্ষরটি সূরা আল কালামের ১৩৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

নিম্নে আরবী বর্ণমালার ২৮টি অক্ষর দেখানো হলো-

ج	ث	ت	ب	ا
ر	ذ	د	خ	ح
ض	ص	ش	س	ز
ف	غ	ع	ظ	ط
ن	م	ل	ك	ق
	ى	ه	و	

উপরোক্ত ২৮টি অক্ষর থেকে নিম্নের ১৪টি অক্ষর নিয়ে পবিত্র কোরআনে 'মুকাত্তায়াত' গঠন করা হয়েছে।

ك	ر	م	ل	ا
ط	ص	ع	ى	ه
	ح	ن	ق	س

উপরোক্ত ১৪টি অক্ষর দিয়ে নিম্নের ১৪টি 'মুকাত্তায়াত' গঠন করা হয়েছে।

الٓمٓ حٰمٓ الٓر الٓمٓرٰ

طٰسٓ طٰسٓمٓ يٰسٓ

كٓهٰيٰعٓصٓ الٓمٓصٓ صٓ

قٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ نٓ طٰهٰ

সূরা	মুকাত্তায়াত	সূরা	মুকাত্তায়াত
১০ ১১ ১২	الٓر	২ ৩ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২	الٓمٓ
১৩	الٓمٓرٰ		
১৪ ১৫	الٓر	৪০ ৪১	حٰمٓ
৩৮	صٓ	৪২	حٰمٓ عٓسٓقٓ
৭	الٓمٓصٓ	৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬	حٰمٓ
১৯	كٓهٰيٰعٓصٓ		
৬৮	نٓ	৫০	قٓ
২০	طٰهٰ	২৬	طٰسٓمٓ
		২৭	طٰسٓ
৩৬	يٰسٓ	২৮	طٰسٓمٓ

= মোট ২৯টি সূরা

= ১৪টি অক্ষর

الم	حم	الر	المر
طس	طسم	يس	ن
كهيعص	المص	ص	
ق	عسق	طه	

= ১৪টি মুকাত্তায়াত
= ৫৭ = (১৯×৩)

এখানেও

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

ইহার উপর আছে উনিশ ১৯

প্রথম চিত্রটি দেখলে বোঝা যাবে কোরআনে একক অক্ষরসম্পন্ন (অর্থাৎ একক মুকাত্তায়াত) আরো দুটি সূরা আছে। সে দুটির একটি সূরা ق 'কাফ' নং ৫০ এবং সূরা ص 'সাদ' নং ৩৮। ق মুকাত্তায়াত সম্পন্ন দুটি সূরা আছে। আগেই বলা হয়েছে, একটি হলো সূরা নং ৫০। অপরটি হলো সূরা 'আশশূরা' নং ৪২। এই সূরাতে ق অক্ষরটি ح م ع س এবং ق এইভাবে আছে। ق ح م ع' س সামগ্রিকভাবে সূরাটিতে গুণলে পাওয়া যাবে ৫৭০টি অক্ষর অর্থাৎ ঐ পাঁচটি অক্ষর সূরাটিতে ৫৭০ বার ব্যবহার করা হয়েছে যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৯×৩০=৫৭০)। মহান আল্লাহ্ সঠিক জায়গায় এই সংখ্যাটি স্থাপন করেছেন। পৃঃ ৬২ দেখুন)।

এবার ق অক্ষরটি যে সকল সূরাতে মুকাত্তায়াত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। সূরা দু'টির নম্বর হলো ৪২ এবং ৫০ (সূরা আশশূরা এবং কাফ)। আমাদের খেয়াল রাখা উচিত যে আমরা প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক দৃষ্টিতে

যে সব ঘটনা বা সত্যাসত্য দেখতে পাব, সেটাই বিশ্লেষণ করব। এটা দেখার জন্য দুটো চোখই যথেষ্ট। আপনি এই অলৌকিকত্ব ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। পবিত্র কোরআন কোন মানুষের রচনা নয়। এই সত্যটি বের করার জন্য আরবী ভাষা জানার দরকার নেই। কোন অনুমান বা ব্যাখ্যারও দরকার নেই। শুধুমাত্র ق অক্ষরটি দেখুন যার একটি গোল মাথা আছে আর মাথার ওপর দুটো ফোঁটা আছে। আরবীতে ফোঁটাগুলোকে নোকতা বলা হয়। ق হলো মাথাওয়ালা দুই ফোঁটাযুক্ত একটি অক্ষর। সূরা ق (কাফ) এ এই মাথা ওয়ালা দুই ফোঁটাযুক্ত অক্ষরটি গুনে দেখুন। দেখবেন এরূপ ق ৫৭টি আছে, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৯×৩=৫৭) এবং সূরা নং ৪২ এও ৫৭টি ق আছে (১৯×৩=৫৭) এইরূপ লেখা মানুষ দ্বারা কি সম্ভব? আমরা ইলেকট্রিক কম্পিউটারকে পরে জিজ্ঞেস করব।

সূরা ঃ আল-কালাম, সূরা নং-৬৮

بسم الله الرحمن الرحيم

١- نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ.

১। নূন– শপথ কলমের এবং ইহার যা লিপিবদ্ধ করে তার।

٢- مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

২। তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।

٣- وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ.

৩। অবশ্যই তোমার জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

٤- وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

৪। নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।

এই সূরার মুকাত্তায়াত হচ্ছে ن। সূরাটিতে ৫২টি আয়াত আছে। সম্পূর্ণ সূরাতে ১৩৩টি ن আছে মুকাত্তায়াতসহ। ১৩৩টি ن = ১৯×৭

এখানেও

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

ইহার উপরে আছে উনিশ।

সূরা : কাফ, সূরা নং-৫০

بسم الله الرحمن الرحيم

١- قٓ. وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ.

ক্বফ, শপথ মহিমান্বিত কুরআনের।

٢- بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ.

বরং তারা বিস্ময় বোধ করে যে, তাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হয়েছে, আর কাফেররা বলে, ইহাতো এক আশ্চর্য ব্যাপার!

সূরা কাফ এ ق অক্ষরটি গণনা করুন।

এই সূরাতে ৪৫টি আয়াত আছে। সূরার সবগুলো কাফ গণনা করলে মুকাত্তায়াতসহ ৫৭টি ق পাওয়া যাবে যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। ৫৭টি ق=১৯×৩

এখানেও

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

ইহার উপরে আছে উনিশ। "১৯"

এই সূরা দুটিতে (সূরা আশশূরা এবং কাফ) যে কয়টি ق অক্ষর আছে, তা একত্রে যোগ করলে সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৪টি। অর্থাৎ ১৯×৬=১১৪। যুক্তিসংগতভাবে আমরা ধরে নিতে পারি ق অক্ষরটির দ্বারা এখানে পবিত্র কোরআনকেই নির্দেশ করছে। কারণ পবিত্র কোরআনে ১১৪টি সূরা আছে। বলতে গেলে প্রত্যেকটি সূরার জন্য একটি করে ق নির্ধারিত। পবিত্র কোরআনের রচনাকারী মহান আল্লাহ এর দ্বারা আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন। কোরআনের প্রত্যেকটি সূরাই হলো কোরআন, এককভাবে কোরআন এবং পবিত্র কোরআন ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূরা নং ৪২ ও ৫০ ق অক্ষরটি গুনতে আপনার কয়েক মিনিট সময় নেবে আপনি পবিত্র কোরআন রচনার অলৌকিকত্ব অনুভব করতে শুরু করবেন। কোরআনে হাফেজ অর্থাৎ কোরআন যাদের মুখস্থ তারা এই ق অক্ষরটির গণনা সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারেন। যদি আপনি নিষ্ফল হোন তাহলে চোখে দেখে গণনা করে নিন। বুঝতে পারবেন কি বিস্ময়কর অসাধারণ কাজ এটা। যদি হযরত মোহাম্মদ (সা) কোরআন রচনা করে থাকতেন, তাহলে এই গণনার কাজটা তাঁকে সত্যি ধরে রাখতে হতো; কারণ তিনি লেখা বা পড়া কোনটাই জানতেন না।

এমনকি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালীও এইরূপ কর্ম সম্পাদন করতে কঠিন সমস্যায় পড়তেন। কিন্তু পবিত্র কোরআনের রচয়িতা মহান আল্লাহর এতে বিন্দুমাত্র সমস্যা হয়নি। যদি কেউ মনে করে থাকেন এই বিষ্ময়কর ঘটনা হঠাৎ ঘটে গিয়েছে অথবা কোন সুপার কম্পিউটার এই গণনার কাজ সম্পাদন করেছে, তাহলে মানুষের চেয়েও শক্তিশালী কোন ক্ষমতাবান এই কাজে জড়িত ছিলেন বলে তাকে মানতে হবে।

যদি ধরেও নেয়া হয় যে হযরত মোহাম্মদ (সা) ق সম্পন্ন সূরা দুটি ১৯ সংখ্যার ভিত্তিতে রচনা করেছেন, তাহলে হযরত মোহাম্মদকে (সা) মনে মনে এই দুটি সূরার ق কে গণনার মধ্যে রাখতে হতো এই মনে করে যে ق গুলোকে ১৯ দ্বারা ভাগে মেলাতে হবে। এবং পরে কাতিবগণকে শ্রুতি লিখনের জন্য বলতে হতো। কিন্তু তা হয়নি। আয়াত পড়ে একবার যখন লিখে ফেলা হতো, তখন আর প্রত্যাহার করা হতো না। এটাই ছিল পবিত্র কোরআন লিখনের নিয়ম।

ধরা যাক, হযরত মোহাম্মদ (সা) ق অক্ষর দ্বারা সূরা নম্বর ৪২ এর ৫৭টি আয়াত লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সূরা নম্বর ৫০ ? তিনি যদি সূরা নম্বর ৫০-এ এই ق অক্ষরটি গণনা করতেন তাহলে সেখানে ৫৮টি ق দেখতে পেতেন, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। তাহলে তাঁকে আরো ১৮টি ق দিয়ে আয়াত তৈরী করতে হতো অথবা একটি ق বাদ দিতে হতো। অবশ্য এই ক্ষেত্রে একটি ق বাদ দেয়াই সহজ ছিলো। কিন্তু কোন ق টি ? তিনি ৫০ নং সূরাটির মুকাত্তায়াত ق দিয়েই শুরু করেছিলেন। আর এই ق টি বাদ দেয়া বোধ হয় আরো সহজ ছিল; তাহলে সমস্যার একটি সমাধান হতে পারতো। কিন্তু না! কোরআন রচনার সামগ্রিক নিয়মটি হচ্ছে যে এই মুকাত্তায়াতগুলো গণনার মধ্যে ধরতে হবে বা আবদ্ধ

করতে হবে এবং তাদেরকে ১৯ সংখ্যা দিয়ে বিভাজন করা হলেই সর্বদর্শী অঙ্কশাস্ত্রবিদ মহান আল্লাহ্র কার্যাবলীর নিদর্শন পাওয়া যাবে। বিগত ১৪০০ বছর ধরে ১১৪টি সূরার মধ্যে একটি সূরাও যদি হারিয়ে যেত বা নতুন সংযোজিত হতো তাহলে আর তাকে ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজন বা ভাগ করা যেতো না।

পবিত্র কোরআনে যে ১৪টি অক্ষর দিয়ে মুকাত্তায়াত তৈরী করা হয়েছে, তার মধ্যে একটিও যদি বাদ পড়তো বা অতিরিক্ত যোগ করা হতো বা গোপনে কোন কিছু রদ বদল করা হতো, তাহলে এই বিস্ময়কর গাণিতিক বুনন খান খান হয়ে গরমিল দেখা দিত। তখন কোরআনকে সংশোধনের জন্য অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কাতারে সামিল করতে হতো। কিন্তু বিগত ১৪০০ বছর যাবত তা হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। কারণ এর প্রকৃত রচয়িতা মহান আল্লাহ্ এই ব্যাপারে তাঁর প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ করেছেন নিম্নে উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

আমিই তোমার নিকট কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি।

وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

এবং আমিই ইহাকে সংরক্ষণ করবো (দূষণ হতে)। (সূরা হিজ্‌র ঃ আয়াত-৯)

পবিত্র কোরআনের অর্ধেকটাই সরাসরি এই জটিল গাণিতিক বুননে রচিত মুকাত্তায়াত সম্বলিত কোরআনের এই ২৯টি সূরায় মুকাত্তায়াতের প্রতিটি অক্ষর এই জটিল গাণিতিক বুননে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আপনাদের মনে থাকতে পারে, যা আগেই বলা হয়েছে, সমগ্র কোরআনে 'আল্লাহ' (الله) শব্দটি ২৬৯৮ বার লেখা আছে। এই الله শব্দটি গড়ে ২.৫ (আড়াই)টি আয়াতে একবার করে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কোরআনের কোন একটি আয়াত আল্লাহর নামেও নতুন যোগ হতো বা কমিয়ে ফেলা হতো, তাহলে আল্লাহর নিয়মই ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেতো। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয়নি আর হবেও না।

অষ্টম অধ্যায়

গাণিতিক অলৌকিকত্ব

পবিত্র কোরআনকে দূষণ থেকে রক্ষা করা এবং সংরক্ষণ করার এই জটিল গাণিতিক পদ্ধতি কোন অপ্রত্যাশিত অথবা আকস্মিকভাবে এমনকি কোন দুর্ঘটনাক্রমে ঘটানো কি সম্ভব? 'জ্ঞান ও সত্য সম্বলিত কোরআনের এই বিশুদ্ধ পদ্ধতি' (purity of Style, of Wisdom and of Truth-Rev.R. Bosworth Smith) কি কোন প্রাণহীন কম্পিউটার সৃষ্টি করতে পারে? মহান আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব পন্থায় আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে পবিত্র কোরআন রচনা কোন অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক ঘটনা নয়; এটা সম্পূর্ণভাবে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন এক অলৌকিক রচনা। মহান আল্লাহ্ তাঁর রচনার মধ্যে রহস্যের ছাপ রক্ষা করেছেন।

যদি কোন মানুষ কোরআনের মতো গ্রন্থ্ রচনার ক্ষেত্রে এরূপ অতি প্রকৃত উদ্যোগ গ্রহণ করতো, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি অসম্ভবকে অতিক্রম করার সময় কমপক্ষে ইতস্তঃ বোধ করতেন। কিন্তু মহান আল্লাহ এই অসম্ভবগুলো সহজেই অতিক্রম করেছেন এবং নিজের সৃষ্ট সমস্যা কাউকে সাক্ষী না রেখে নিজেই সমাধান করেছিলেন। এই কাজে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। যাতে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি।

মহান আল্লাহ্ আমাদের দেখাতে চেয়েছেন যে কোন মানব সন্তান যদি এই কোরআন রচনা করে থাকতো, তাহলে ভালোয় ভালোয় সব কিছু হয়ে গেলেও সূরা ৫০-এর একটি অতিরিক্ত ق নিয়ে সে অসুবিধায় পড়তো। আপনারা অবশ্যই খেয়াল করেছেন, সূরা নং ৪২ এবং ৫০ এর ق এর সংখ্যা ১১৫ হতে পারতো। অবশ্য বর্তমানে এই দুই সূরায় ১১৪টি ق-ই আছে। যদি হযরত মোহাম্মদ (সা) কোরআন রচনা করেই থাকতেন তাহলে তাঁকে উক্ত দুটি সূরার আয়াতগুলো রচনা করে মনে গেঁথে রাখতে হতো, কারণ তিনি লেখাপড়া জানতেন না। মনে রাখার জন্য তাঁকে মুখস্থ্ করতে হতো। একবার চিন্তা করুন, যে লেখা আপনি দেখেননি, সেগুলো মনে রাখা কত কষ্টকর।

আমরা সবাই জানি হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর কাছ থেকে শুনে 'কাতিবগণ' (লেখকগণ) কোরআন লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি যখন কাতিবগণকে কোরআনের শ্রুতি লিখন দিতেন তখন মনে হতো তিনি যেন মুখস্থ পাঠ করছেন। অর্থাৎ যে অংশটুকু কাতিবগণকে লিখতে বলতেন, মনে হতো তিনি যেন মুখস্থ করেই ঐ অংশটুকু কাতিবগণের কাছে শ্রুতিলিপি দিচ্ছেন।

অবিশ্বাসীদের মতোই আমরা ধরে নিলাম হযরত মোহাম্মদ (সা) উপরোক্ত অসম্ভবটুকুও সম্ভব করেছেন। কিন্তু যখন ৪২ ও ৫০ নং সূরার ق অক্ষরটি গণনা করে দেখলেন যে এতে ১১৫টি ق আছে এবং তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। কিন্তু সূরার প্রথমে মুকাত্তায়াত কেন বাদ দেয়া যাবে না, তা আগেই বলা হয়েছে (কারণ মুকাত্তায়াত অক্ষর গণনার মধ্যে ধরা অপরিহার্য। এটাকে কোনক্রমেই বাদ দেয়া যাবে না)। ৫০নং সূরার মধ্যে পরবর্তী ق যে আয়াতটিতে আছে তাহলো-

وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ -

ইহাই মহিমাময় কোরআন।

এই 'কোরআন' শব্দটি পবিত্র কালামে আরো ত্রিশটি নামে অভিহিত করা হয়েছে যেমন আল-কিতাব, আল-ফোরকান, আল-বুরহান, আল জিকর, আত-তানযিল ইত্যাদি। আমরা কোনক্রমেই এর রচয়িতা মহান আল্লাহর চেয়ে জ্ঞানী নই। তিনি আমাদের জানাতে চেয়েছেন উপরোক্ত আয়াতের ق অক্ষরটি শুধুমাত্র এই 'কোরআন' শব্দটির জন্য প্রযোজ্য। তা না হলে এর গুরুত্ব হ্রাস পেতো। এই ভাবে আমাদের গ্রন্থকার মহান আল্লাহ তাঁর চরম পরিপূর্ণতা প্রদর্শন করলেন। মহান আল্লাহ ق অক্ষর দ্বারা তৈরী আয়াতের গুচ্ছ থেকে ১৩নং আয়াতে এসে এই সমস্যার সমাধান করলেন। ১২, ১৩ ও ১৪নং আয়াত মিলে বর্তমানে ৪টি ق আছে (পৃঃ ৬২)।

قَوْمُ لُوْطٍ

'কওমুল লূত' শব্দটি পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ১২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ১৩ বারের সময় সূরা কাফ এর ১৩নং আয়াতে এসে 'ইখওয়ানুল লূত' বলা হয়েছ।

١٢- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ، وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ

١٣- وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ

١٤- وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ. كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ

লক্ষ্য করুন

وَاِخْوَانُ لُوْطٍ

(সূরা কাফ : আয়াত ১২-১৪)

সূরা-আশশূরা — সূরা নং-৪২

بسم الله الرحمن الرحيم

حٰمٓ . عٓسٓقٓ.

كَذٰلِكَ يُوْحِىْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ـ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

ক. এই সূরাতে ৫৩টি আয়াত আছে। এই সূরার সবগুলো ق গণনা করলে ৫৭টি কাফ (ق) পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ১৯×৩ = ৫৭

খ. এই সূরায় যে ৫টি অক্ষর মুকাত্তায়াত হিসেবে উল্লেখ করা আছে, সেগুলো সূরার মধ্যে গণনা করলে সামগ্রিক যোগফল হবে ৫৭০, যা ১৯ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য (১৯×৩০=৫৭০)

এই তিনটি আয়াতে ৫টি ق থাকার কথা ছিল। আপনারা কি বলতে চান, কোরআনের আয়াত পরিবর্তন করা হয়েছে? না, তা হয়নি। দেখুন, গ্রন্থকার মহান আল্লাহ এখানেও তার অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করলেন। এই পৃষ্ঠায় উপরের বক্সের শব্দ দুটি দেখুন। 'ইখওয়ানুল লুত' اِخْوَانُ لُوْطٍ অর্থাৎ লুত সম্প্রদায় শব্দটি

দেখুন। এটা قَوْمُ لُوطٍ 'কওমুল লুত' অর্থাৎ লুত জাতি হওয়ার কথা। এটা قَوْمُ لُوطٍ কেন হবে, প্রশ্ন জাগতে পারে। কারণ কোরআনের রচয়িতা বিভিন্ন সূরায় লুত জাতিকে قَوْمُ لُوطٍ বলে ১২ বার সম্বোধন করেছেন। পবিত্র কোরআনে ১২ বার তাদেরকে قَوْمُ لُوطٍ বলার পর ১৩নং আয়াতে ১৩ বারের সময়ে তাদেরকে إِخْوَانُ لُوطٍ বলে উল্লেখ করেছেন।

এখন গ্রন্থকার যিনি এই একই সূরার ১২, ১৩ ও ১৪নং আয়াতে অন্যান্য জাতিকে 'কওম' বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে কোন কারণ ছাড়াই 'কওমুল লূত' কে 'ইখওয়ানুল লূত' বলে উল্লেখ করতে পারেন।

একজন মনযোগী পাঠক কোরআনের সূরা ق এর ১৩নং আয়াতে এই পরিবর্তন অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন। গ্রন্থকার হিসেবে একজন মানুষ তার বইয়ে এক ডজনবার 'কওমুল লূত' বলার পর ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কি এইরূপ পরিবর্তন করতে পারেন? যেখানে গাণিতিক বুননের জটিলতা আছে। এইদিক দিয়ে ১৩নং আয়াতে আরো একটি ق থাকার কথা। তাহলে সম্পূর্ণ সূরাটিতে ৫৮টি ق থাকতো, যা ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হতো না। আল্লাহ তায়ালা বলেননি, 'আলাইহা তিস্‌আতা আশারা।' অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ১৯ দ্বারা গণনা করার জন্য বলেছি।

কোরআন শরীফে একক মুকাত্তায়াত সম্বলিত আরেকটি সূরা আছে। তার নাম সূরা 'সাদ' যা ৩৮নং সূরা হিসেবে গ্রন্থিত। একটু খেয়াল করুন, সূরা নম্বর ৫০ এর ق মুকাত্তায়াত এবং সূরা নম্বর ৬৮ এর ن মুকাত্তায়াতটিরও কোন অনুবাদ হয়নি। সেরূপ সূরা 'সাদ' এর ص মুকাত্তায়াতটিরও কোন অনুবাদ হয় না। কোন অনুবাদকই কোন মুকাত্তায়াতের অনুবাদ করার দুঃসাহস বা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেননি। ব্যাখ্যা হয়তো দিয়েছেন। কিন্তু কোনক্রমেই অনুবাদ করতে পারেননি। আল্লাহ তায়ালার মহানুভবতায় আমরা আজ দেখতে পাই যে তিনি কোরআনের বাণীকে গাণিতিক বুননের দ্বারা বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। বিশ্লেষণের জন্য এটা খুবই সহজ ও সরল ব্যবস্থা। কিন্তু পবিত্র কোরআনের অতীতের এবং আধুনিক যুগের তাফসীরকারকদের কাছে এই খণ্ডনীয় এবং সুস্পষ্ট সত্যটি কিভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলো? কারণ একটাই। তা হচ্ছে বিষয়টি তখনও প্রকাশের সময় হয়নি। সময় তখন উপযোগী ছিল না।

সূরা নং ৩৮ (সূরা সাদ) এ এককভাবে এবং অন্য আরো দুটি সূরা (সূরা নং-৭ ও ১৯) অন্যান্য মুকাত্তায়াতের সাথে ص অক্ষরটি বিদ্যমান। কোন সূরাতে যদি ৩ অথবা ৪ অক্ষর দিয়ে মুকাত্তায়াত গঠন করা হয় তাহলে সবকয়টি মুকাত্তায়াত অক্ষর সূরাতে গণনা করতে হবে এবং যোগ করলে ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হবে। তবে এই ক্ষেত্রে আমরা ص অক্ষরটি সূরা সাদ-এ এবং যুক্তভাবে সূরা নং ৭ এবং ১৯ (সূরা আরাফ এবং সূরা মারিয়াম) এর صগুলো গণনা করব (নীচে বক্স দেখুন)। এই তিনটি সূরার ص গণনা করলে মোট ১৫২টি ص পাওয়া যাবে যা ১৯ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য (১৯×৮=১৫২)।

এখানেও

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

ইহার উপরে আছে 'উনিশ' '১৯'

সূরা নং - ৭

সুরা আরাফ এর মুকাত্তায়াত المص

সূরা নং ১৯

সুরা মারিয়ামের মুকাত্তায়াত كهيعص

সূরা নং ৩৮

সূরা সাদ এর মুকাত্তায়াত ص

উপরোক্ত তিনটি সূরাতেই ص মুকাত্তায়াত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

সংখ্যা	সাদ	মুকাত্তায়াত	সূরা নং
৯৮টি	ص	المص	৭
২৬টি	ص	كهيعص	১৯
২৮টি	ص	ص	৩৮

= ১৫২ (১৯×৮)

আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আল্লাহ্ শুধু মাত্র একটি অক্ষর 'ص' কে চিত্তাকর্ষক করেননি। সূরা 'আরাফ' (নং-৭) এর ৪টি মুকাত্তায়াত, সূরা 'মারিয়াম' (নং-১৯) এর ৫টি মুকাত্তায়াত ও সূরা 'সাদ' (নং-৩৮) এর একটি মুকাত্তায়াত সর্বমোট ১০টি মুকাত্তায়াত নিয়ে আলোচনা করা যাক। কম্পিউটারের মাধ্যমে গণনা করুন-বিস্ময়ের শেষ নেই। তাই আমাদের নবী আল্লাহর কাছে অবনত হয়ে প্রার্থনা করতেন- 'হে আল্লাহ আমাকে আরও জ্ঞান দাও, হে আল্লাহ, আমার জ্ঞানকে সম্প্রসারিত কর।'

সূরা নং-৭- ا ل م ص। আলিফ, লাম, মিম, ছোয়াদ এই ৪টি অক্ষর মুকাত্তায়াত হিসেবে বিদ্যমান। গণনা করে দেখা যাক :

ا (আলিফ)	= ২৫৭২টি
ل (লাম)	= ১৫২৩টি
م (মিম)	= ১১৬৫টি
ص (ছোয়াদ)	= ৯৮টি
মোট	= ৫৩৫৮টি

সবগুলোর যোগফল ৫৩৬৮টি যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৯×২৮২)।

সূরা নং-১৯। এতে كهيعص এই পাঁচটি অক্ষর মুকাত্তায়াত হিসেবে আছে। গণনা করুন, দেখতে পাবেন-

ك (কাফ) আছে ১৩৭টি

ه (হা) আছে ১৬৮টি

ى (ইয়া) আছে ৩৪৫টি

ع (আইন) আছে ১২২টি

ص (ছোয়াদ) আছে ২৬টি

মোট- ৭৯৮টি = ১৯×৪২

এখানেও

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

ইহার উপরে আছে উনিশ (১৯)

সূরা নম্বর ৭-এ (সূরা আরাফ) মহান আল্লাহর আরো একটি অলৌকিক নিদর্শন বিদ্যমান। এই সূরার ৬৯নং আয়াতে (পৃঃ ৬৭) بَصۜطَةً 'বাসতাতান' একটি শব্দ আছে। শব্দটির বানানের দিকে খেয়াল করুন (ت) (ط) (ص) (ب) অর্থাৎ এই বানানটিতে একটি ص আছে। কিন্তু এই ص এর ওপর ছোট্ট একটি س ও আছে। এটার অর্থ এই যে যদিও বানানটি ص দিয়ে লেখা হয়েছে কিন্তু এর উচ্চারণ হবে س এর মতো। আরবী ভাষায় এবং কোটি কোটি আরবদের কাছে এমনকি তাদের আঞ্চলিক ভাষায় ص দিয়ে 'বাসতাতান' বানান নেই। উল্লেখ্য যে আরবী ভাষা একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক ভাষা। আমরা যা শুনি, বানানও সেইরূপ করা হয়। আমাদের বাংলা ভাষায়ও এরূপ শব্দ বিদ্যমান। যেমন, পানি শব্দটি উচ্চারণ করলে 'ন' দিয়ে উচ্চারণ করা হয়, আবার 'ণ' দিয়ে করলেও উচ্চারণের কোন ব্যতিক্রম হয় না। অনুরূপ 'মাংস' শব্দটিও উচ্চারণ করলে 'মাংশ' অথবা 'মাংষ' অর্থাৎ 'শ' অথবা 'ষ' সহযোগেও উচ্চারণ করা যায়।* তা হলে এখানে بَصۜطَةً বানানটি ص দিয়ে লেখা হলো কেন?

উল্লেখ্য যে এই ৭ নম্বর সূরার ৬৯ নম্বর আয়াতে যখন 'বাসতাতান' বানানটি কাতিবগণ س দিয়ে লিখতে যাচ্ছিলেন আমাদের নবী কাতিবগণকে তখন বললেন যে এই আয়াতে 'বাসতাতান' শব্দটির বানান س এর পরিবর্তে ص দিয়ে লেখার জন্য হযরত জিব্রাইল (আ) নির্দেশ দিয়েছেন। কাতিবগণ নবীকে জানালেন যে, 'বাসতাতান' বানানটি আরবীতে س দিয়ে লেখা হয়ে থাকে, ص দিয়ে নয়। আমাদের নবী উত্তর দিলেন যে তিনি নিরক্ষর। তাঁকে হযরত জিব্রাইল (আ) বানানটি ص দিয়ে লেখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যেহেতু শব্দটির উচ্চারণ س এর মতো সেইহেতু ص এর ওপর ছোট্ট একটি س দেয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং 'বাসতাতান' বানানটি কাতিবগণ এই আয়াতে ص দিয়েই লিখলেন। এই বানানটি ১৪০০ বছর যাবত এইভাবেই চলে আসছে। কেউ এটাকে س দিয়ে লেখার সাহস ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারেনি।

---

* লেখক তাঁর বইয়ে উদাহরণস্বরূপ ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষার উদাহরণটি অনুবাদককৃত —অনুবাদক।

সূরা-৭ : আয়াত ৬৯

.... وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً

এবং স্মরণ করো আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে দৈহিক গঠনে অধিকতর হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ করেছেন।

بَصْۜطَةً

বানান ب ص ط ت

বানানটি ص দিয়ে করা হয়েছে।

কিন্তু উচ্চারণ হবে بسطة

অর্থাৎ س দিয়ে।

ص এর ওপর ছোট্ট س টি লক্ষ্য করুন صۜ

ص দিয়ে কেন লেখা হলো যেখানে উচ্চারণ হবে س দিয়ে?

কাতিবগণ কি بَصْۜطَةً বানানটি জানতেন না?

উত্তরের জন্য সুরা বাকারার ২৪৭ নং আয়াতটি দেখুন।

সূরা ৭ এর ৬৯ নং আয়াতে যদি 'বাসতাতান' শব্দটি س দিয়ে লেখা হতো, তা হলে ص মুকাত্তায়াত সম্বলিত তিনটি সূরার ص অক্ষরের সংখ্যা হতো ১৫১, যা কখনও ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হতো না। তাই সূরার এই আয়াতে ص অক্ষর দিয়ে 'বাসতাতান' শব্দের বানান লেখা হয়েছে।

কাতিবগণ জানতেন 'বাসতাতান' বানানটি س দিয়েই লেখা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে (সূরা নং ৭ ঃ ৬৯) ص দিয়েই লিখতে হলো। সূরা বাকারার ২৪৭ নং আয়াতটি দেখুন। সেখানে 'বাসতাতান' শব্দের বানান س দিয়েই লেখা হয়েছে (পৃঃ ৬৮)। এটা সত্য যে আমাদের বাংলা ভাষায় 'পানি' শব্দটির উচ্চারণ 'পানি' দিয়ে করি তাতে শ্রুতিতে কিছু আসে যায় না। বলার সময় 'পানি' 'পানিই' থাকে। হঠাৎ করে জিব্রাইল (আ) 'বাসতাতান' শব্দটির বানান س এর পরিবর্তে কেন ص দিয়ে লিখতে বললেন?

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে হাজার বছর ধরে পবিত্র কোরআন হাতে লিখে অনুলিপি তৈরী করা হয়েছে এবং দাদা থেকে পিতা, পিতা থেকে পুত্রের নিকট ঐ হাতে লেখা কোরআনই এসেছে। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার হাজার বছর পরও কোন ছাপাখানা ছিল না। কোরআন শরীফের সূরা বাকারার ২৪৭নং আয়াতে 'বাসতাতান' শব্দের বানান س দিয়েই তাঁরা লিখে এসেছেন এবং তাতে উচ্চারণের কোন তারতম্য হয়নি, কারণ আগেই বলেছি শব্দটি ধ্বনিতত্ত্বের সাথে জড়িত।

কিন্তু ৭ নম্বর সূরায় ৬৯নং আয়াতে কোরআনের ঐ সব অনুলিপিকারগণ 'বাসতাতান' শব্দটির বানান ص দিয়ে লেখা দেখে নিশ্চয়ই বিচলিত হয়েছেন। হয়তো মনে করতে পারতেন, তার পিতা বা দাদা কোরআন অনুলিপি করতে গিয়ে এই ভুলটি করেছেন! কিন্তু না! তারা কেউ এই বানান পরিবর্তন করার সাহস করেননি, কারণ মহান আল্লাহ্ বানানটি ص দিয়ে লেখার জন্যই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই আজ পর্যন্তও এই 'বাসতাতান' শব্দের বানান ص দিয়েই থেকে গিয়েছে। অতীতে হাতে লেখা কোরআন শরীফ 'বাসতাতান' শব্দের এই বানান পরিবর্তন করা যায়নি। যদি কোন লেখক বা অনুলিপিকার এই বানান শুদ্ধ করতে হবে বলে মনে করে س দিয়ে লেখার চেষ্টা করতো, তাহলে আমরা আল্লাহর কালামে তিনটি ص মুকাত্তায়াত সম্পন্ন সূরায় ১৫২টি ص এর পরিবর্তে ১৫১টি ص পেতাম, যা কখনই ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হতো না।

সূরা বাকারা : আয়াত-২৪৭

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط

নবী বললেন, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাঁকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।

বানান

ب س ط ت

তাহলে আমরা কেন এই পবিত্র কালামের রচয়িতা মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং সর্ববিরাজমান মহান আল্লাহর নিকট সেজদায় নত হবো না? তাঁকে জানার জন্য এবং চেনার জন্য তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করেছেন।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَٰفِظُونَ.

আমিই তোমার নিকট কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ইহাকে সংরক্ষণ করব (দূষণ হতে)। সূরা হিজ্‌র ঃ আয়াত-৯

মুকাত্তায়াত সম্পন্ন প্রত্যেকটি সূরা বিশ্লেষণ করলে মহান আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির আশ্চর্যজনক ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি সূরাতে মুকাত্তায়াতের অক্ষরগুলো গণনা করুন, দেখবেন যোগফল ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য। এই জটিল গাণিতিক বুননে কোরআন শরীফ রচনা করার সময় ও সাধ্য কার ছিলো? ইতিহাসের ব্যস্ততম মানুষ হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর নিশ্চয়ই ছিলনা! অবিশ্বাসীরা কি এখনও আমাদের বলবে যে আরবের বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে জটিল গাণিতিক বুননে কোরআন শরীফ রচনার জন্য হযরত মোহাম্মদ (সা) কোন কম্পিউটারে লুকিয়ে রেখেছিলেন? যেখানে তারা নিজেরাই বলেছে, 'Illiterate himself, Scarcely able to read or write'. অর্থাৎ নিজে ছিলেন নিরক্ষর, আদৌ লিখতে বা পড়তে পারতেন না?

এই বিস্ময়কর আবিষ্কার সম্বন্ধে ইংগিত দেয়া প্রয়োজন। যারা এই বিষয়ে আরো গভীর গবেষণা করতে চান, তারা যেন লেবাননের কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডক্টর রাশেদ খলিফার লিখিত বই এবং ভিডিও টেপ ৩০০ (তিনশত টাকা দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রা) হাদিয়া প্রদান করে ইসলামিক টেপ লাইব্রেরী, ৩১৮ সায়ানি সেন্টার, ১৬৫ গ্রেষ্ট্রিট, ডারবান দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সংগ্রহ করেন। ঐ বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দেয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি (মূল লেখক) ডক্টর রাশেদ খলিফার নিকট ঋণী। ইসলামের খেদমত করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ জীবন দান করুন।

অধ্যায়টি শেষ করার পূর্বে الم। মুকাত্তায়াত যে সকল সূরাসমূহে বিদ্যমান, সেগুলোর জটিল গাণিতিক বুননের অলৌকিকত্ব তুলে ধরতে চাই (পৃঃ ৭০)। গুনে একটি কাগজে তুলে নিন এবং যোগ ফলটি দেখুন। প্রয়োজনে ক্যালকুলেটর বা ইলেকট্রোনিক কম্পিউটারের সাহায্যও নিতে পারেন।

। আলিফ, ل লাম এবং م মিম কোরআন শরীফের যে আটটি সূরাতে মুকাত্তায়াত

হিসেবে আছে, সেই সূরার মধ্যে এই তিনটি অক্ষরের সর্বমোট যোগফল ২৬৬৭৬। হযরত মোহাম্মদ (সা) ২৩ বছর যাবত এই সংখ্যাটি গণনা করে মুখস্থ করে রেখেছিলেন বলে ধরা হলে তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার হতো। সব চেয়ে বড় সত্য হলো তিনি যদি এই জটিল গাণিতিক বুননের মাধ্যমে কোরআন শরীফ রচনা করে থাকতেন তাহলে তিনি কি এই কথা কারো কাছে বলতেন না? যেখানে হযরত আবু বকর (রা)-এর মতো তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন, ছিলেন তাঁর প্রিয় বিবি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)। তাঁদের কারো কাছে তিনি এই কথা বলেননি। তাঁর ওফাতের দিন পর্যন্ত কোরআন শরীফ রচনার ক্ষেত্রে তিনি কোন কৃতিত্বও দাবী করেননি। এই নীরবতার কি কোন ব্যাখ্যা আছে?

الٓمٓ

সূরা নং	সূরার নাম	م	ل	ا
২	আল-বাকারা	২১৯৫	৩২০৪	৪৫৯২
৩	আলে-ইমরান	১২৫১	১৮৮৫	২৫৭৮
৭	আ'রাফ	১১৬৫	১৫২৩	২৫৭২
১৩	রা'দ	২৬০	৪৭৯	৬২৫
২৯	আনকাবূত	৩৪৭	৫৫৪	৭৮৪
৩০	রূম	৩১৮	৩৯৬	৫৪৫
৩১	লুকমান	১৭৭	২৯৮	৩৪৮
৩২	সাজদা	১৫৮	১৫৪	২৬৮

৫৮৭১+ ৮৪৯৩+ ১২৩১২

= ২৬৬৭৬

অর্থাৎ ১৯×১৪০৪ = ২৬৬৭৬

এখানেও

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

"ইহার উপরে আছে উনিশ।" "১৯"

নবম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ বাণী এবং পূর্ণতা

জটিল গাণিতিক বুননের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন রচনার ক্ষেত্রে আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, কোন মানুষ বা সমগ্র মানব জাতি তাদের সমস্ত কম্পিউটার এবং ক্যালকুলেটর সহযোগেও গণিতের অলৌকিক বুননে পবিত্র কোরআনের মতো একটি কিতাব বা গ্রন্থ্ রচনা করতে পারবে না। পবিত্র কোরআন হচ্ছে একটি 'পরম অলৌকিক সৃষ্টি'। কারো যদি এর রচয়িতা মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তাহলে কম্পিউটারকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।

পবিত্র কোরআন শরীফকে ইলেকট্রোনিক কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর এই কাজটি করেছেন লেবাননের কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডক্টর রাশেদ খলিফা। তিনি কম্পিউটারকে জিজ্ঞাসা করেন : ১৯ সংখ্যার ভিত্তিতে গাণিতিক বুননের মাধ্যমে কোরআনের মতো একটি নিখুঁত গ্রন্থ্ রচনা করার ঘটনা আকস্মিকভাবে কতটুকু ঘটতে পারে। কম্পিউটার যা জানায়, তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এই ধরনের গাণিতিক বুনন হয়তো ঘটে যেতে পারে, তবে সম্ভাবনা হলো ৬২৬ সেপ্টেলিয়ন ভাগের এক ভাগ। 'সেপ্টেলিয়ন' কি সেটা পরে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে।

একশত ভাগের এক ভাগ নয়, এক হাজার ভাগের একভাগ নয়, লক্ষ্য ভাগের এক ভাগ নয়। এমনকি এক কোটি ভাগের এক ভাগও নয়। একশত কোটি ভাগের এক ভাগও নয়। ৬২৬ সেপ্টেলিয়ন ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ

১

―――――――――――――――――

৬২৬, 000000000000000000000000 ভাগ। ৬২৬ সংখ্যার পর ২৪টি শূন্য দিলে যত হয়, তার এক ভাগ। এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অর্থাৎ উপরোক্ত সংখ্যার কোরআন শরীফ লেখা হলে তার মধ্যে হয়তো বা একটি আকস্মিকভাবে গাণিতিক বুননের মধ্যে পড়বে।

পবিত্র কোরআনের এই গাণিতিক বুনন সম্পর্কে আরো নতুন নতুন তথ্য ও সত্য বেরিয়ে আসছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটনা বা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির চেয়েও উপরে বর্ণিত সংখ্যার বিস্তৃতি কি ভয়ানক, এটা অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করতেই হবে। পৃথিবীতে জীবন পরিচালন এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে :

ক. পৃথিবীকে অবশ্যই তার ২৩.৫ ডিগ্রী অক্ষপথে হেলে থাকতে হবে।

খ. পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি সঠিক থাকতে হবে।

গ. সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কাছেও না এবং দূরেও না অর্থাৎ সঠিক অবস্থানে থাকতে হবে।

ঘ. চাঁদের বর্তমান দূরত্ব সংরক্ষিত থাকতে হবে এবং

ঙ বায়ুলোকে গ্যাসের পরিমাণ বর্তমান হারেই থাকতে হবে।

আমাদের গ্রহে জীবন পরিচালনা এবং বাঁচার সম্ভাবনার জন্য উপরোক্ত শর্তগুলোর পরিবর্তন কোটি ভাগের এক ভাগ এদিক সেদিক হয়েও যেতে পারে। কিন্তু কোরআনের একটি মাত্র দিকই 'সেপ্টেলিয়ন' পর্যায়ে পড়ে। মহান আল্লাহর দান এই আশ্চর্য্য কিতাব সম্পর্কে আমাদের আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ আবিষ্কৃত এই দিকটি আমাদের মুসলমানদের জন্য কি সত্য বহন করে এনেছে? পৃথিবীতে আমরা প্রায় ১২৫ কোটি মুসলমান বাস করছি, সংখ্যার দিক দিয়েই আমরা অনেক। পেট্রোডলার এবং মেধা নিয়ে আমরা যদি নিজেদের সৃজনশীল কাজে নিয়োগ না করি, তাহলে আমরা আমেরিকা ও রাশিয়ার সমকক্ষ হতে পারবো না। বিজ্ঞান এবং মহাকাশ গবেষণায় আমরা যদি এক পা এগিয়ে যাই, তাহলে তারা দশ পা এগিয়ে থাকে। আমরা কখনই তাদের সমান হতে পারবো না। এটা মুসলমানদের মানসিকতা হতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের আরো বাস্তবমুখী হতে হবে।

মহান আল্লাহ এই পবিত্র কালামের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমাদের 'দ্বীনকে (জীবন বিধান) সবার ওপর স্থান দিয়েছেন।

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

তিনিই (মহান আল্লাহ) যিনি রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াতসহ এবং দ্বীন ও সত্যসহ যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর একে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। যদিও মুশরিকরা ইহা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ্ : আয়াত ৯)

একই প্রতিজ্ঞা তিনি ৪৮ নং সূরার ২৮ নম্বর আয়াতে পুনর্ব্যক্ত করেছেন :

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (সূরা ফাত্‌হ ঃ আয়াত ২৮)

মহান আল্লাহর এই সব বাণী কিভাবে পূরণ হবে। যদি আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট হাস্যম্পদ হয়ে থাকি! আমাদের সমস্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি নিজকে আজেবাজে কর্মে নিয়োজিত রেখে আমাদের শক্তির অপচয় করি, তাহলে আমরা অবিশ্বাসী ও কমিউনিষ্ট এবং খ্রীশ্চিয়ানদেরকে কিভাবে আমাদের দ্বীনে আসার আহবান জানাব? এই অধঃপতিত অবস্থা থেকে আমরা উত্তীর্ণ হবো বলে আশা করি। যার হাতে অলৌকিক শক্তি বিদ্যমান, তিনি আমাদের বিজয় এনে দেবেন।

وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا.

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। (সূরা নিসা : আয়াত ১১২)

ইতিহাসের ক্রমবিকাশে দেখা যায় মহান আল্লাহ্ কিভাবে তাঁর পরিকল্পনা বার বার পূর্ণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর আরবরা অন্ধকার থেকে আলোয় কিভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ঐতিহাসিকরা তা নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। টমাস কার্লাইল আরবদের এই পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন :

"A poor shepherd people, roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world, A Hero-Prophet was sent down to them with a word they could believe: see, the unnoticed becomes world-notable, the small has grown world great; within one century afterwords, Arabia is at Granada on this hand, at Delhi on that:-glancing in valour and splendour and the light of genius,

Arabia shines through long ages over a great section of the world...These Arabs, the man Mohomet, and that one century– is it not as if a spark had fallen, one spark on a world of what seemed black unnoticeable sand; but Lo! the sand proves explosive powder, blazes heaven– high from Delhi to Granada!"

"অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন হতে মরুভূমির অখ্যাত যাযাবর একটি জাতির নিকট বিশ্বাসযোগ্য একটি বাণী দিয়ে একজন বীর-নবীকে প্রেরণ করা হল, অখ্যাত জাতি হল পৃথিবী বিখ্যাত, একটি ক্ষুদ্র জাতি বিরাট হয়ে উঠল, এক শতাব্দীর মধ্যে আরবরা তাদের সাম্রাজ্য গ্রানাডা হতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত করল। তাদের সাহস, ঐশ্বর্য এবং জ্ঞানের আলো বহু যুগ ধরে পৃথিবীর একটি অংশকে আলোকিত করেছিল। এই আরব জাতি, এই নবী মোহাম্মদ এবং এই একটি শতাব্দী-এইগুলো কি আলোর বিচ্ছুরণ নয়? অখ্যাত বালুকাময় মরুভূমিতে এই আলোর স্পর্শ একটি বিস্ফোরণে পরিণত হল। দিল্লী হতে গ্রানাডা পর্যন্ত আকাশ বাতাস আলোকিত করে তুলল।"

উপরোক্ত বক্তব্য ছিল ইসলামের একজন সমালোচক বন্ধুর। অপরদিকে একজন ইহুদীর বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য দেখুন, যিনি চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাস লিখতে গিয়ে আরবদের সম্পর্কে হিংসার আগুনে জ্বলে উঠে উক্তি করেছিলেন' : "উষ্ট্রচালক এবং মেষপালকগণ সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছে!" কি গভীর সত্য ঘৃণার সাথে বেরিয়ে এসেছে তার লেখনী থেকে। সেমেটিক জাতি ও ফোয়েনিসিয়ানরা ব্যবসায়ী হিসেবে ইউরোপে গিয়েছে। কিন্তু একমাত্র আরবরা অর্থাৎ মুসলমানরাই সেখানে গিয়েছে বাদশাহ্ হিসেবে।

অতীতে মহান আল্লাহ্ তাই করেছেন, ভবিষ্যতে আবারো করতে পারেন। দুর্ধর্ষ মোগলদের কথা স্মরণ করুন। তারা ছিল ইসলাম সাম্রাজ্য বিজয়ী, তাদের উপর ইসলাম কিভাবে বিজয় লাভ করেছিল? প্রথম দিকে বর্বর ও প্রচণ্ড আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত একটি জাতি কিভাবে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছিল?

মহান আল্লাহর রহমতের নিদর্শনে ইতিহাস পরিপূর্ণ। তাঁর রহমত জাতিকে অতল অন্ধকার থেকে এক গৌরবময় স্থানে দ্রুত অধিষ্ঠিত করলো। তাঁর রহমত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। আণবিক অস্ত্র, মহাশূন্য রকেট, বিরাট ছাপাখানা সমস্ত সম্পদ এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা নিয়ে আজকের পৃথিবীর শক্তিমান জাতিরা যদি আমাদের 'দ্বীন' (জীবন বিধান) বা ধর্ম গ্রহণ করতো, তাহলে এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় হতো না।

অস্ত্রের পরিবর্তে বুদ্ধি এবং জ্ঞান দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সাথে মুখোমুখি হওয়ার সুবিধা ও অধিকার আমাদের আছে। কারন বুদ্ধি এবং জ্ঞানে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের উপরে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে একটি জীবন বিধান দিয়েছেন। এর জন্যে কারো কাছে আমাদের নত হতে হবে না। মানব সমাজের সমস্ত সমস্যার সমাধান ও উত্তর ইসলাম প্রদান করেছে। প্রথমে শুধু অবিশ্বাসীদেরকে ইসলামের সৌন্দর্য ও জ্ঞানের আলোকে বিকশিত করাতে হবে। রাত যেমন দিনের অনুসরণ করে, পরবর্তীতে তাই হবে। অবিশ্বাসীদের কাছে প্রমাণ করতে হবে, কোরআন হযরত মোহাম্মদের (সা) রচনা নয়। আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত সত্যিকারের একটি কিতাব।

প্রকাশ করতে হবে, কোরআন একটি অলৌকিক রচনা, যা একমাত্র সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারেন না। এক হাতে পবিত্র কোরআন এবং অপর হাতে যুক্তি দিয়ে অবিশ্বাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণে আমন্ত্রণ জানানো আমাদের কর্তব্য। চলুন আমরা সমগ্র মানব জাতির হৃদয়কে জয় করি।

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

আল্লাহর পথে আমন্ত্রণ জানাও (সবাইকে) বিজ্ঞোচিতভাবে। (সূরা নাহল : আয়াত ১২৫)

মানুষের অজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাদের নিকট সত্যের আলো তুলে ধরাই হচ্ছে জ্ঞানের দাবী। বর্তমানে আমরা কম্পিউটার যুগে বাস করছি। তার যাদুর স্পর্শ ছাড়া আমাদের সমস্ত উন্নতি থেমে যাবে। আজকের বিমান ব্যবস্থা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং টেলিফোন ব্যবস্থা কম্পিউটার ছাড়া অচল। বর্তমানে আমেরিকার টেলিফোন ব্যবস্থাকে যদি কম্পিউটার থেকে আলাদা করা হয়, একমাত্র এই ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য আমেরিকার ১৮ থেকে ৪৫ বছরের সব মহিলার প্রয়োজন হবে।

এই কম্পিউটার কি? কেউ না দেখেও বলতে পারে কম্পিউটার কি এবং এটা কি করতে পারে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, এই কম্পিউটার সঠিক উত্তরটিই দিয়ে থাকে। এটার মালিক ক্রিশ্চিয়ানই হোক আর কমিউনিষ্টই হোক। আপনি একে জিজ্ঞেস করুন, ১+১+১ = কত? এটা সঠিক উত্তর দেবে = ৩। কোন রোমান ক্যাথলিক (ক্রিশ্চিয়ানদের একটি সম্প্রদায়) মালিকের কম্পিউটারকে আপনি জিজ্ঞেস করুন, 'পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর- কয়টি ঈশ্বর হলো? কম্পিউটার সাথে সাথে জবাব দেবে=৩টি ইশ্বর। মালিকের জন্য কম্পিউটারের কোন অনুভূতি নেই, সহানুভূতি নেই যে তার মালিক যা বলবে, তাই সে উত্তর দেবে।

পৃথিবীর শিক্ষিত জাতিগুলোর সাথে কথা বলার একটি ভাষা আছে, যা সবাই দ্রুত বুঝতে পারে। তাহলো "প্রকৃত বিজ্ঞান" অর্থাৎ গণিত বা অঙ্ক। তাদেরকে আপনি কোরআনের এই জটিল গাণিতিক বুনন দেখিয়ে বোঝাতে পারেন এর গ্রন্থকার বা রচয়িতা হচ্ছেন মহান আল্লাহ, যিনি এই পবিত্র কিতাবকে যে কোন হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করেছেন এবং রচনার দাবীর স্বপক্ষে চ্যালেঞ্জ করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا
الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.

বল, যদি সমগ্র মানব জাতি এবং জিন উভয়ে একত্রিত হয়, রচনা করতে কোরআনের মত অনুরূপ একটি কিতাব, তাতেও তারা এর মত রচনা করতে পারবে না কোন কিছু। এমনকি যদি তারা সকলে পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও। (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ৮৮)

পবিত্র কোরআনের এই নতুন আবিষ্কারের ফলে আমরা নিম্ন লিখিত সাফল্য পেতে পারি।

১. অবিশ্বাসীদের মনে ইসলাম সম্পর্কে এই আবিষ্কার এক বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে।

২. জুলে ম্যাসারম্যান এবং মাইকেল এইচ হার্টের মতো সরল ইহুদী ও ক্রিশ্চিয়ান যারা ইসলাম সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখেন- কোরআন হযরত

মোহাম্মদের নিকট প্রেরিত এবং আবিষ্কৃতরূপে আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত আল্লাহর বাণী বলে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মানো সহজ হবে।

৩. কোরআন আল্লাহর বাণী এই কথা মুসলমানদের বিশ্বাসকে আরো মজবুত করবে।

৪. এই কিতাবের অনুসরণকারী সমগ্র মুসলমানদের হৃদয় থেকে সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হবে। এবং

৫. সবশেষে, যে সমস্ত কপট, ভণ্ড এবং গোঁড়া ধর্ম উন্মত্ত মানুষ আল্লাহর বাণীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহ যে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবেন, তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

উপসংহারে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি তিনি যেন আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর উপর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত প্রদান করেন, মুসলমানদেরকে তাঁর রহমত পাওয়ার অনুপ্রেরণা যোগান এবং যারা তাঁর এবাদত করেন, তাঁদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেন। আমিন।

وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ.

বরং আল্লাহ দ্রুত পুরস্কৃত করবেন তাদের যারা কৃতজ্ঞতার সাথে ইবাদত করেন। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৪)

অতিরিক্ত সংযোজনী

*** ১৯ সংখ্যার ভিত্তিতে পবিত্র কোরআন নাযিল সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য।**

এই গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রথমে নাযিলকৃত সূরা আল-আলাকের ৫টি আয়াতসমূহের শব্দ ও অক্ষর ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য।

দ্বিতীয় ওহী সূরা আল-কালামের (সূরা নং ৬৮) যে ৯টি আয়াত নাযিল করা হয়, তার শব্দ সংখ্যা-৩৮ অর্থাৎ ১৯ সংখ্যার বিভাজ্য (১৯×২=৩৮)।

তৃতীয় ওহীর সময় সূরা মুজাম্মিলের (সূরা নং ৭৩) ১০টি আয়াত নাযিল হয়। ঐ দশটি আয়াতের শব্দ সংখ্যা ৫৭, যা ১৯ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য (১৯×৩=৫৭)।

চতুর্থ বারে "আলাইহা তিসআতা আশারা" (সূরা মুদ্দাস্‌সির এর ৩০ নং আয়াত) এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ১৯ সংখ্যার অপরিহার্য গুরুত্ব প্রকাশ করলেন।

এছাড়া এই গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, ডক্টর রাশেদ খলিফা যখন কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করেন, ১৯ সংখ্যার ভিত্তিতে পবিত্র কোরআনের মতো কোন গ্রন্থ রচনা সম্ভব কিনা? উত্তরে কম্পিউটার জানায়, এরূপ বুননে তা হয়তো ঘটে যেতে পারে, তবে সম্ভাবনা হলো :

$$\frac{১}{৬২৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০}$$

ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ ১৯ সংখ্যার ভিত্তিতে পবিত্র কোরআনের মতো গ্রন্থ রচনা করতে গেলে উপরোক্ত সংখ্যার গ্রন্থ রচনা করতে হবে, তাহলে হয়তো এর মধ্যে একটি গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের মতো হলেও হতে পারে।

এখন কথা হলো, পবিত্র কোরআনে ৬৬৬৬টি আয়াত আছে এবং ঐ আয়াতগুলোতে ৮,৬৪,৪৩০টি শব্দ আছে। আর ৮,৬৪,৪৩০টি শব্দ সম্বলিত ৬২৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টি গ্রন্থ রচনা করা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিরূপ অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখা যাক।

৮,৬৪,৪৩০ শব্দ সম্বলিত গ্রন্থ প্রতিদিনে যদি একটি করেও রচনা করা হয়, তাহলে ৬২৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টি গ্রন্থ রচনা করতে সময় লাগবে ১,৭১৫,০৬৮,৪০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বছর। বৈজ্ঞানিকদের মতে আমাদের এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে ১৫০০ কোটি বছর আগে। কম্পিউটারের মতে ১৯ এর গাণিতিক বুননের ভিত্তিতে কোরআনের মতো গ্রন্থ রচনা আকস্মিকভাবে ঘটাতে হলে যে সময়ের প্রযোজন হবে, সে সময়ের মধ্যে বহু লক্ষ কোটি পৃথিবীই নয় বহু লক্ষ কোটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং বহু মহাবিশ্বও লয় পাবে। কিন্তু পবিত্র কোরআনের মতো একটি গ্রন্থও সৃষ্টি হবে না। তাই কম্পিউটার স্বীকার করেছে, কোরআনের মতো গ্রন্থ রচনা মানুষ বা কোন জীবজন্তুর পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে সূরা বনি ইসরাঈলের ৮৮নং আয়াতে (পৃঃ ৭৬) মহান আল্লাহ যে চ্যালেঞ্জ করেছেন তা খন্ডন করার শক্তি কারোর নেই।

আল্লাহ মহান, মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ স্বত্বা।

---

* উপরোক্ত তথ্যগুলো অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত।

লেখক পরিচিতি

শেখ আহমেদ দিদাত ১৯১৮ সনে ভারতের সুরাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন নয় বছর (১৯২৭ সন) তখন তাঁর পিতা দক্ষিণ আফ্রিকায় অভিবাসী হন। তাঁর বাবা পেশায় দর্জি ছিলেন। বাবার আর্থিক দুরাবস্থার কারণে অল্পদিনের মধ্যে তাঁকে শিক্ষা জীবন শেষ করে মাত্র ষোল বছর বয়সে উপার্জনে নামতে হয়।

তিনি খ্রিস্টানদের পরিচালিত মিশনারী স্কুলে পড়াশুনাকালে খ্রিস্টীয় ধর্ম সম্পর্কে জানতে সক্ষম হন। ১৯৩৬ সনে খ্রিস্টান যাজকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিকটবর্তী একটি সেন্টারে কাজ নেন। প্রশিক্ষণার্থী যাজকরা অব্যাহতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে বলতো এবং আহমেদ দিদাতকে অপমানিত করতো। বিষয়টি তাঁর মনে দাগ কাটে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন, ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের অযৌক্তিক বক্তব্যকে তিনি খণ্ডন করবেন।

এই সময় তিনি ইমাম ও যাজকদের মধ্যকার ধর্মীয় সংলাপ সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এরপর থেকে তিনি ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের ওপর ব্যাপক পড়াশুনা করেন। তিনি ইসলামের যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি বাইবেলেরও একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

১৯৪০ সনে একটি সিনেমা হলে 'মুহাম্মদ (সা) শান্তির বার্তাবাহী' শীর্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি দাওয়াতী কাজে নেমে পড়েন। স্পষ্ট ও খোলাখুলি বক্তৃতার কারণে তাঁর বক্তৃতা শ্রোতাদের মধ্যে দারুণ প্রভাব বিস্তার করতো।

তাঁর বক্তৃতা শুনে দক্ষিণ আফ্রিকার অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, যাদের মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারীও ছিলো।

১৯৮১ সনে ডারবানের বিশপ জোশ ম্যাকডোয়েলের 'ওয়াজ খৃস্ট ক্রুসিফাইড' শীর্ষক বিতর্কটি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৫৭ সনে শেখ আহমেদ দিদাত তাঁর দুই বন্ধুকে নিয়ে Islamic Propagation Centre প্রতিষ্ঠা করেন। এই সেন্টার থেকে নানা ধরনের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বব্যাপী বিলি করা হয়। অনেক নওমুসলিমকে এ সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১৯৮৬ সনে শেখ আহমেদ দিদাত সৌদি আরবে একটি সম্মেলনে যোগ দেন। সেখানে তিনি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এই সাক্ষাৎকারে গোটা আরব বিশ্ব তাঁর গতিশীল ব্যক্তিত্ব ও ধর্মের উপর তুলনামূলক জ্ঞানের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে।

তিনি বৃটেন, মরক্কো, কেনিয়া, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক ও আমেরিকা সফর করেন এবং বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর আমেরিকা সফরে 'ইন দ্যা বাইবেল দ্যা ওয়ার্ড অব গড' শিরোনামের বিতর্কের প্রতিপক্ষ ছিলেন আমেরিকান রেভারেন্ড জিমি সাগার্ট। বিতর্কটি ৮ হাজার লোক প্রত্যক্ষ করে এবং ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য ৪০ হাজার লোকের সমাগমের ঘটনাও ঘটেছে।

১৯৮৬ সনে শেখ আহমেদ দিদাতকে কিং ফয়সল আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯৯৬ সালের ৩ মে তিনি অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। সেখানে একটি অসাধারণ বক্তব্য পেশ করেন। এরপরই তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং তাঁকে সৌদি আরবের রিয়াদে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়। তিনি প্যারালাইজড হয়ে যান।

টানা নয় বছর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভেরুলামে নিজের বাড়ীতে প্যারালাইজড অবস্থায় বিছানায় কাটিয়েছেন।

গত ৮ আগস্ট, ২০০৫ সকাল সাতটায় দক্ষিণ আফ্রিকার কাওয়াজুলু নাতাল প্রদেশের ভেরুলামে নিজ বাড়ীতে শেখ আহমেদ দিদাত ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

শেখ আহমেদ দিদাত ২০টিরও বেশী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : The Choice Between Islam and Christanity, Is the Bible God's word, Al Quran the Ultimate Miracle, what the Bible Says about Muhammad (SM) ইত্যাদি।

RAQS
Publications
230 New Elephant Road, Dhaka

RAQS Publication's Series : 01
ISBN 984-32-1680-0